KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল - ১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রেজাবন
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৪৭/৭ ৪৭/৮ ৪৭/৯ ৪৭/১১ ৪৭/১২	Year of Publication : Nov 1986 Dec 1986 Jan 1987 March 1987 April 1987
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

ডিসেম্বর
১৯৮৬

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ : 'মানবেন্দ্রনাথের মানসলোক' : এই বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের সারা জীবনের বিচিত্র কর্মধারা এবং ক্রমবিবর্তিত তত্ত্বচিন্তার পরিচয় ॥

বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রী তথা কমিউনিসটরা কি তাঁদের ইতিহাসনির্দিষ্ট ভূমিকা যথাযথ-ভাবে পালন করতে পেরেছেন ? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন বাংলাদেশের কমিউনিসট পার্টির অন্যতম সম্পাদক, মননশীল লেখক অজয় রায় ॥

গত পঞ্চাশ বছরে বাঙলার গণমুখী নবনাট্য আন্দোলনের, তার সাফল্য আর ব্যর্থতার, সামগ্রিক পর্যালোচনা : অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাক্ষণের প্রতীক্ষায়' ॥

১৯০০-১৯৩০ : এই কালসীমায় বাঙালি মুসলমান লেখকদের রচিত উপন্যাসের বিষয়বস্তু, চরিত্রগুলির শ্রেণীচরিত্র নিয়ে অধ্যাপক রশীদ আল ফারুকীর তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা ॥

'বিশ্বসাহিত্য' বিভাগে একটি অসাধারণ ইন্দোনেশীয় উপন্যাসের উপর আলোকপাত— অনিরুদ্ধ চৌধুরী ॥

'দেশেবিদেশে' বিভাগে কমনওয়েলথের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস বলেছেন ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥

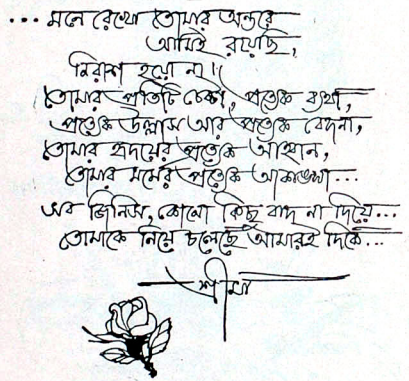

...মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ৮
ডিসেমবর ১৯৮৬
অগ্রহায়ণ ১৩৯৩

মানবেন্দ্রনাথের মানসলোক অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৮৩
বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাস-নির্দিষ্ট অবস্থিতি অজয় রায় ৬১১
মহাক্ষণের প্রতীক্ষায় অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৮

ফুটন্ত নিখিলকুমার নন্দী ৫৯৫
উভচর শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী ৫৯৭
কাশীনাথপুরের মেয়েরা মাসুদ খান ৫৯৮
শালবনে সন্ধ্যা ফারুক আলমগীর ৫৯৯

অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৬০০
তেলনাহান অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ৬২০

সমাজচিত্র ৬৩৮
মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে মধ্যবিত্তশ্রেণী রশীদ আল ফারুকী ৬৩৮

গ্রন্থসমালোচনা ৬৪৬
কালীপদ সিংহ, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বসাহিত্য ৬৫৫
একটি অসাধারণ ইন্দোনেশীয় উপন্যাস অনিরুদ্ধ চৌধুরী

দেশে বিদেশে ৬৬০
কমনওয়েলথ : কোথা থেকে কোথায় ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নাটক ৬৬৬
একালের চোখে সেকালের জমিদার মঞ্জুশ্রী গুপ্ত

স্মরণে ৬৬৮
অরুণ বাগচী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

North India Wires Limited

"Regent House"

12, Government Place East, Calcutta-700 069

Phone : 22-1123, 22-1373
23-6007

Telex : 021-3496 NIWL IN
Gram : PURMO

Manufacturers of Quality Bright Bars & Shaftings in the widest range, with high dimensional accuracy and excellent finish from the latest imported plant by Cold Draw Process, Centreless Turning or Centreless Grinding. Available in Mild Steel, Stainless Steel and other varieties of Tools & Alloy Steel including ENIA Leaded and Non-leeded.

মানবেন্দ্রনাথের মানসলোক

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ এক নির্ভীক সৈনিক। সক্রিয় রাজনীতিতে নিজের স্থিরীকৃত আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ছিল অবিচল, এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির যে নগ্ন বীভৎসতা আজ আমরা চারিপাশে অহরহ প্রত্যক্ষ করছি, তিনি চিরদিনই ছিলেন তার ঊর্ধ্বে। এ ছাড়া চিন্তার জগতে তাঁর মৌলিক বিশিষ্টতাও অনস্বীকার্য। বস্তুত, যে মুষ্টিমেয় মননশীল ভারতীয়ের সৃজনশীল প্রতিভার সাযুজ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা স্বকীয়তা লাভ করেছে মানবেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তথাপি মানবেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক উপেক্ষিত নায়ক। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবন এবং সাধনার বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত প্রায় অজ্ঞাত। শুধুমাত্র তাঁর এক ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী সযত্নে লালন করে চলেছেন এই অনন্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতি। কেন মানবেন্দ্রনাথের ভাগ্যে জুটেছে এই ভ্রাত্যের অসম্মান—নিতান্ত মুক্তমনে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। বস্তুত, তাঁর কর্ম আর চিন্তার সাফল্য এবং ব্যর্থতার নিরপেক্ষ বিচারই হবে জন্মশতবর্ষে তাঁর মতো মানুষের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৭ সনের ২১শে মার্চ এবং ১৯৫৪ সনের ২৫শে জানুয়ারি তাঁর জীবনাবসান ঘটে। জীবনের প্রথম উনত্রিশ বছর তিনি পরিচিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে, যা ছিল তাঁর পরিবারদত্ত প্রকৃত নাম। ১৯১৬ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণকালে তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়, এই নাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর বাকি জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডযুক্ত হয় এই নামের সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথের নতুন নাম গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনে ছিল এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ নতুন নাম গ্রহণের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চিন্তা আর কর্মের প্রবাহে দেখা দেয় আমূল পরিবর্তন; জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত হন মার্কসবাদী বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথে। অবশ্য এই সাম্যবাদী বিপ্লবী সত্তাও শেষ পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায় তাঁর স্বরচিত মানবতাবাদী দর্শনের কল্পলোকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানবেন্দ্রনাথের জীবনে রাজনৈতিক বিশ্বাসের স্থিরতা ছিল ক্ষণস্থায়ী। তাঁর রাজনৈতিক জীবন কোনোদিনই সরলরেখায় চলে নি, তাতে লক্ষ করা যায় কয়েকটি অভাবনীয় বাঁক, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সংগতভাবেই তাঁর জীবনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্বের নায়ক স্বভাবতই নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর কৈশোরে দেখা দিয়েছিল পরিপার্শ্বের প্রকৃতি-জগতের রহস্যভেদের এক তীব্র আকুতি। অপরিচিত সুদূর ও অজ্ঞাত, অপার্থিব জগৎ অনুসন্ধানের তাগিদে তিনি সাধুসঙ্গও করেন, এবং এক সময়ে রামদাস বাবাজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। প্রকৃতপক্ষে এসব কিছুই ছিল এক অপরিণত রোম্যান্টিক কিশোরের নিজের সত্তা আবিষ্কারের উন্মাদনা এবং এই উন্মাদনার অবসান ঘটে তাঁর সতেরো বছর বয়সে যখন তিনি অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে এসে কালক্রমে নিজেকে যুক্ত করেন বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্যোগ এবং আয়োজনের সঙ্গে। এই সময় থেকে ১৯১৫ সন পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ এক উগ্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্রে তিনি উজ্জীবিত, বলপ্রয়োগের দ্বারা ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদে তিনি বদ্ধপরিকর, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম তাঁর জীবনের বরেণ্য নায়ক এবং সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম পুরোধা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) তাঁর কর্মগুরু। এই পর্বে তিনি অনেকগুলি রাজনৈতিক ডাকাতিতে যোগদান করেন, ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের স্মৃতিনির্ভর সূত্রের ভিত্তিতে সমরেন রায়-প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী হত্যা করেন ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের সঙ্গে যুক্ত কুখ্যাত পুলিস অফিসার নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কে এবং অস্ত্র-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ দূত হিসাবে দুইবার বাটাভিয়ায় যান। দ্বিতীয়বার বাটাভিয়া পরিভ্রমণকালে তিনি বাঘা যতীনের মৃত্যুবরণের সংবাদ পান এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান ১৯১৬ সনের ১৫ই জুন, মানবেন্দ্রনাথ রায় এই নতুন নামের পরিচয়ে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের দশ মাসের মধ্যেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং জামিন লাভের সঙ্গে-সঙ্গেই গোপনে চলে যান মেকসিকোতে। তাঁর জীবনীকারদের মতে, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রেই তিনি সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন। বস্তুত, মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তাঁর এতদিনের লালিত বৈপ্লবিক এবং রাজনৈতিক কর্মপন্থায় পরিবর্তন দেখা দেয়। অবশ্য ঠিক কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে এবং কেমন করে এই পরিবর্তন ঘটে—এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য কেউ-ই দিতে পারেন নি। তবে মেকসিকোতে অবস্থানকালে তাঁর সাম্যবাদী মতাদর্শ যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, এবং কেউ-কেউ মনে করে থাকেন যে, মেকসিকোতে কমিনটার্‌ন্ প্রতিনিধি বরোদিন (Borodin)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগেই মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শে রূপান্তর ঘটায়। বস্তুত, অধ্যাপক রবার্ট নর্থ (Robert C. North)-এর দৃঢ় অভিমত এই যে বরোদিনই মানবেন্দ্রনাথকে অভিষিক্ত করেন সাম্যবাদে। যাই হোক, মানবেন্দ্রনাথের ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্বের শুরু মেকসিকোতেই।

মেকসিকোতে মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন আড়াই বছর। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রূপান্তরিত হন এক নতুন মানুষে যাঁর কাছে অতীত দিনের রোমাঞ্চকর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্যোগ-আয়োজন নিতান্তই অর্থহীন। তাঁর আত্মকথায় তিনি জানিয়েছেন যে মেকসিকোতে তাঁর উপলব্ধি ঘটে যে তাঁর সামনে দেখা দিয়েছে এক নতুন রাজনৈতিক কর্ম-প্রকল্প এবং পুরানো অ্যাডভেনচারের অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে। মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনে এই পটপরিবর্তনের প্রথম আভাস পাওয়া যায় মেকসিকোর গেলস্ ম্যাগাজিন (Gale's Magazine) নামক পত্রিকায় ১৯১৯ সনের অগস্ট মাসে প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে। রাওলাট আইনের কণ্ঠরোধী উৎপীড়ন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের আগ্রাসী ভূমিকার এক তথ্যনির্ভর বিবরণ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরাই ছিল এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই রচনায় ব্রিটিশ

শাসনে অত্যাচারে জর্জরিত ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য এবং দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে মানবেন্দ্রনাথ জানান যে ১৯১৯ সনেই নিরস্ত্র ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ভারতবর্ষে এক সামগ্রিক বিদ্রোহের অবস্থার সূচনা করেছে (তাঁর নিজের ভাষায়: "The whole country is in a state of rebellion".)। এই পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথের ভাষ্যের সুর অবশ্যই এক জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকের। কিন্তু তারপরেই তিনি যে বক্তব্য রাখেন তা নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত দেয় তাঁর মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির। তিনি তাঁর প্রবন্ধের শেষাংশে এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলন শুধুমাত্র একটি দেশের অভ্যন্তরীণ জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম নয়, এর একটি বিশেষ বিশ্বজনীন তাৎপর্যও আছে। কারণ ব্রিটেনের সমাজশীর্ষে অধিষ্ঠিত ধনতন্ত্রের শক্তির অন্যতম উৎস হল ব্রিটিশ শক্তির ভারতীয় শোষণ। যতদিন এই শোষণ অব্যাহত থাকবে ততদিন এই ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে স্বতোৎসারিত প্রবল সমৃদ্ধির কল্যাণে ব্রিটেনের জাতীয় ধনতন্ত্র এমনই শক্তিধর হয়ে থাকবে যে সে দেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর পক্ষে এই ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব হবে। অর্থাৎ, এক কথায়, মানবেন্দ্রনাথের মতে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত বিশ্ব-ধনতন্ত্র বিনাশের জরুরি বৃহত্তর প্রশ্ন।

মানবেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক চেতনায় গুণগত মৌল পরিবর্তনের যে আংশিক পরিচয় এই প্রবন্ধে পাওয়া যায় তা অল্প সময়ের ব্যবধানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত অ্যান ইনডিয়ান কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (An Indian Communist Manifesto) নামে ইশতাহারে। লেনিনের আমন্ত্রণে ১৯২০ সনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদানের উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্রনাথ মসকো রওনা হওয়ার পথে বারলিনে আসেন, এবং সেখান থেকেই প্রকাশ করেন এই ইশতাহার। এই ইশতাহারে স্বাক্ষরকারী হিসাবে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আরও দুজনের নাম থাকলেও মানবেন্দ্রনাথই একক ভাবে ছিলেন এটির রচয়িতা। এই রচনায় মানবেন্দ্রনাথ সোচ্চার হয়ে ওঠেন তাঁর নবলব্ধ প্রত্যয়ে যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সংগ্রামে রাজনৈতিক মুক্তিই শেষ কথা নয়, চূড়ান্ত লক্ষ্য হল শ্রেণীশাসনের অবসান এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তি। একজন প্রকৃত মার্কসবাদীর মতোই তিনি এখন মনে করেন যে, সামাজিক বিপ্লব এবং সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই মুক্তি সম্ভব। এই বিশ্বাসের আলোকে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ এর সীমাবদ্ধতা এবং ব্যর্থতা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তাঁর এই ইশতাহারে।

তাঁর মতে, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য হল ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করে বুরজোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, যার সহায়তায় ব্রিটিশ মূলধনীদের পরিবর্তে জাতীয় বুরজোয়া শ্রেণী শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর শাসন এবং শোষণ অব্যাহত রাখবে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধতা স্বভাবতই তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ উৎপীড়িত জনগণ থেকে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক স্বতঃস্ফূর্ত সুতাকল ধর্মঘট প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষের বিষয়গত অবস্থা প্রলেতারীয় বিপ্লবের অনুকূল। এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের জাগ্রত বিপ্লবী জনমতকে ব্যবহার করা দরকার সাম্যবাদের লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ শ্রমজীবী শ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থে। এই শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাথমিক ধাপ অবশ্যই ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি, কিন্তু জাতীয় বুরজোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে এই মুক্তিলাভের চেষ্টা করা হলে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। অতএব প্রয়োজন সংঘবদ্ধ এবং শ্রেণী-সচেতন শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগ্রামের, এবং এই সংগ্রামে

সর্বাত্মক সাহায্য দেওয়ার দায়িত্ব ব্রিটেন তথা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের প্রলেতারীয় শক্তির। বস্তুত, মানবেন্দ্রনাথের স্থির বিশ্বাস এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তথা অন্যান্য উপনিবেশ ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রিটেনে প্রলেতারীয় বিপ্লব সুদূরপরাহত। কারণ উপনিবেশ থেকে আহৃত প্রভূত মুনাফার সাহায্যে ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক শক্তি স্বদেশের শ্রমজীবী শ্রেণীকে নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তুষ্ট করে রেখে খর্ব করবে তাদের বৈপ্লবিক শক্তিকে। কাজেই মানবেন্দ্রনাথের অভিমত এই যে, ভারতবর্ষের মতো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামের সাফল্যের ওপরেই নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ।

১৯২০ সনে তৃতীয় কমিউনিস্ট্ আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগদান মানবেন্দ্রনাথের জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; কারণ এই ঘটনাই সূচনা করে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের তৃতীয় পর্বের, যে পর্বে তাঁর চিন্তা এবং কর্ম দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং নিঃসন্দেহে আলোড়ন তোলে সাম্যবাদী শিবিরে। দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতীয় ঔপনিবেশিক প্রশ্নে লেনিন-রচিত মূল খসড়া দলিলের পাশাপাশি মানবেন্দ্রনাথ একটি স্বতন্ত্র খসড়া দলিল পেশ করেন, যা তাঁর পরিপূরক থিসিস (Supplementary Thesis) নামে সুবিখ্যাত। অ্যান ইনডিয়ান কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টোয় বিধৃত তাত্ত্বিক প্রকল্পই আরও সংহতরূপে উপস্থাপিত হয় এই পরিপূরক থিসিসে। এই দলিলে মূলত চারটি যুক্তি পেশ করা হয়। প্রথমত, ইয়োরোপীয় ধনতন্ত্র বিনাশের উদ্যোগ শুরু করা দরকার এশিয়ার ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশগুলিতে ইয়োরোপীয় ভূখণ্ডে নয়। কারণ ইয়োরোপীয় ধনতন্ত্রের শক্তি ও সমৃদ্ধির উৎস হল ঔপনিবেশিক শোষণ। এই শোষণব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করতে পারলেই সঙ্গে-সঙ্গে ইয়োরোপীয় ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। উল্লেখ্য যে ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফার সাহায্যেই ব্রিটেনে তথা ইয়োরোপে ধনতান্ত্রিক শক্তি নিজেদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রমজীবী শ্রেণীকে প্রাচুর্যের মোহে আচ্ছন্ন করে রেখে তাদের সংগ্রামবিমুখ করে। অতএব ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অবসান ছাড়া ইয়োরোপীয় ধনতন্ত্রের ধ্বংস-সাধন অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে মানবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, কমিউনিস্ট্ আন্তর্জাতিকের আশু কর্তব্য হবে উপনিবেশগুলির সেইসব বৈপ্লবিক শক্তির সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ স্থাপন যারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু মনে রাখা দরকার—এবং এটিই মানবেন্দ্রনাথের তৃতীয় যুক্তি—যে সংশ্লিষ্ট উপনিবেশগুলির জাতীয় বুরজোয়া শ্রেণী অবশ্যই এই বৈপ্লবিক শক্তি নয়। উদাহরণস্বরূপ মানবেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন যে ভারতবর্ষের বুরজোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, যেহেতু উৎপীড়িত শ্রমজীবী ও কৃষকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ এই মধ্যবিত্তমুখী আন্দোলনের লক্ষ্য নয়। বস্তুত, মানবেন্দ্রনাথের মতে, ভারতবর্ষের মতো পরাধীন দেশে দুটি ভিন্নধর্মী আন্দোলনের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়—একটি বুরজোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন যার লক্ষ্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্তি, অন্যটি উৎপীড়িত শ্রেণীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে বুরজোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু এই নেতৃত্বের কোনো বৈপ্লবিক চরিত্র নেই এবং উপনিবেশগুলিতে এই নেতৃত্ব যে কখনই বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যম হতে পারে না এ বিষয়ে কমিউনিস্ট্ আন্তর্জাতিকের সংশয়মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। পরিপূরক থিসিসে মানবেন্দ্রনাথের চতুর্থ যুক্তি ছিল এই যে, ভারতবর্ষের মতো অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর উপনিবেশে বুরজোয়া গণতন্ত্রের পর্যায় অপরিহার্য—এই ধারণা ভ্রান্ত। অর্থাৎ, অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ সাম্যবাদী দলের নেতৃত্বে জাগ্রত

বৈপ্লবিক জনশক্তি উপনিবেশগুলিতে রাজনৈতিক মুক্তিলাভের পর দেশীয় ধনতন্ত্রের গতিরোধ করে সরাসরি অধনতান্ত্রিক পথে বিকাশের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করে তুলতে পারে।

লেনিনের উদ্যোগে দ্বিতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথের এই পরিপূরক থিসিস শেষ পর্যন্ত সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ছিল এই যে, দ্বিতীয় কংগ্রেসে এশিয়ার মুক্তির প্রশ্নে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হলেও, এশিয়ার মুক্তিই ইয়োরোপীয় ধনতন্ত্রের বিনাশের প্রাথমিক শর্ত—মানবেন্দ্রনাথের এই তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, লেনিনের মূল থিসিসে উপনিবেশগুলির বুরজোয়া গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সহযোগিতার সপক্ষে অভিমত দেওয়া হয়। কিন্তু চূড়ান্ত দলিলে বুরজোয়া গণতান্ত্রিক শক্তির পরিবর্তে জাতীয় বৈপ্লবিক শক্তি এই শব্দসমষ্টি ব্যবহৃত হয়। মানবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ধারণা পোষণ করেছিলেন, এবং পরবর্তী কালে তাঁর অনুরাগীরা অবশ্যই তাঁর সঙ্গে একমত যে এই সংশোধিত পরিপূরক থিসিস গ্রহণ প্রমাণ করে যে লেনিন জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে স্পষ্টতই প্রভাবিত হয়েছিলেন মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা। এই ধারণা কতদূর সত্য সে আলোচনায় আমরা পরে আসব। তবে একথা অনস্বীকার্য যে দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট্ আন্তর্জাতিকের কর্মকাণ্ডে তিনি গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেন। তিনি তৃতীয় কমিউনিস্ট্ আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতির অন্তর্ভুক্ত হন এবং তার চীন কমিশনের যুগ্ম সম্পাদক থাকাকালীন তাঁকে ১৯২৭ সনে চীনে পাঠানো হয় সে দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সংকটমোচনের জন্য।

কিন্তু চীনে মানবেন্দ্রনাথের দৌত্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ১৯২৭ সনের জুলাই মাসে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের হাতে পর্যুদস্ত হয় চীনের সাম্যবাদী শক্তি এবং মানবেন্দ্রনাথকে সোভিয়েত দেশে ফিরে যেতে হয় বিফলতার গ্লানি নিয়ে। চীনের এই সাম্যবাদী বিপর্যয়ের পিছনে স্তালিন এবং কমিনটারনের ভ্রান্ত নীতির অথবা কমিনটারন্-প্রতিনিধি বরোদিন ও মানবেন্দ্রনাথের দুই পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপ্রয়াসের দান ছিল কতখানি, তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চীন যাওয়ার আগেই ১৯২৬ সনে প্রকাশিত হয়েছিল মানবেন্দ্রনাথের দ্য ফিউচার অভ ইনডিয়ান পলিটিকস (The Future of Indian Politics) গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পেটি-বুরজোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকার ওপর মানবেন্দ্রনাথ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বস্তুত এই গ্রন্থে তিনি তদানীন্তন ভারতবর্ষে পেটি-বুরজোয়া, কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণীর এক সম্মিলিত ফ্রন্ট্ গঠনের প্রস্তাব করেন এবং এই ফ্রন্টের উদ্যোগে আমূল কৃষিসংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করেন। বলা যেতে পারে যে, চীনে মানবেন্দ্রনাথের কর্মতৎপরতা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এই গ্রন্থে পরিবেশিত প্রকল্পের দ্বারা। কারণ চীনে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন পেটি-বুরজোয়া নেতৃত্বাধীন হুহান Wuhan)-স্থিত বামপন্থী কুয়োমিনটাঙ Kuomintang সরকারের ওপর এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে এই পেটি-বুরজোয়া নেতৃত্ব নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই কৃষিসংস্কারের পথে অগ্রসর হবে। বস্তুত, চীনের তৎকালীন সংকটাবস্থায় তিনি ওয়াঙ চিঙ-য়ি (Wang Ching-Wei)-কে প্রগতিশীল পেটি-বুরজোয়া শক্তির প্রতীকরূপে চিহ্নিত করেন এবং তাঁর ওপর বিশেষ ভরসা রাখেন। কিন্তু, মানবেন্দ্রনাথের তত্ত্বগত বিশ্বাসকে ভ্রান্ত প্রমাণিত ক'রে, কার্যক্ষেত্রে এই ওয়াঙ-ই শেষ পর্যন্ত হাত মেলান প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে এবং এরই পরিণতি হিসাবে চীনের সাম্যবাদীরা বিতাড়িত হন সরকার ও সামরিক বাহিনী থেকে, আর বরোদিন ও মানবেন্দ্রনাথকে মসকো ফিরে যেতে হয় ব্যর্থ ভগ্নদূতরূপে।

কমিনটারনের কার্যকরী সমিতির সপ্তম প্লেনামে

গৃহীত চীন সম্পর্কিত প্রস্তাব রূপায়ণের উদ্দেশ্যেই মানবেন্দ্রনাথকে পাঠানো হয় চীনে। এই প্রস্তাবে চীনের জাতীয় বুরজোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্নে এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। কমিনটারন এই প্রস্তাবে কুয়োমিনটাঙ ও ক্যানটন (Canton)-স্থিত সরকারের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে এই পূর্বানুমানের ভিত্তিতে যে জাতীয় বুরজোয়া শ্রেণী নিজের শ্রেণী-স্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের বিরোধিতা করবে এবং এই বিচারে বাধ্য হবে প্রগতিশীল পদক্ষেপে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনে স্বয়ং উপস্থিত থেকে মানবেন্দ্রনাথ এর বিপরীত চিত্রই প্রত্যক্ষ করেন। সম্ভবত এই চৈনিক অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় বুরজোয়া শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার অসারতা সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ নিঃসংশয় হন। তাই দেখা যায় যে, চীন থেকে ফিরে এসে ১৯২৭ সনের অকটোবর মাসে মানবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক নতুন খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুত করেন, যার ভিত্তি ছিল তাঁর বহু-বিতর্কিত বি-উপনিবেশন (de-colonisation) তত্ত্ব। এই প্রস্তাবে ভারতীয় অবস্থা সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের মূল কথা এই যে, ধনতন্ত্রের যুদ্ধোত্তর সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের দ্রুত শিল্পায়নে অগ্রণী হয়েছে, অর্থাৎ, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ধনতন্ত্রের এক সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে। এই প্রেক্ষাপটে, তাঁর মতে, ভারতীয় অবস্থায় দেখা দিয়েছে এক নতুন পর্যায় যেখানে ভারতীয় ধনতন্ত্রের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সনাতনী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে এবং সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ে ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক শক্তি ও ভারতীয় ধনতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে এক নিবিড় সহযোগ আর সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে। এরই স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে দেখা দেবে স্বতঃস্ফূর্ত বি-উপনিবেশন, অর্থাৎ, ভারতবর্ষকে স্বাভাবিক প্রণালীতেই দেওয়া হবে অধিরাজ্য (dominion)-এর মর্যাদা। এই অবস্থায় মানবেন্দ্রনাথের সুপারিশ ছিল এই যে, যখন ভারতীয় বুরজোয়া শ্রেণী অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের লক্ষ্যে তখন কমিনটারনের পক্ষে সমুচিত কাজ হবে জাতীয় বুরজোয়া আন্দোলনের সঙ্গে সর্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করার জন্য ভারতীয় কমিউনিস্ট্ পার্টিকে পরামর্শ দেওয়া। ১৯২৮ সনে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট্ আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথের এই বি-উপনিবেশনতত্ত্ব প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়, যে সমালোচনার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন কুসীনেন (Otto Kuusinen)। বস্তুত, কুসীনেন তাঁর সমালোচনায় মানেবন্দ্রনাথকে অভিহিত করেন সাম্রাজ্যবাদের ভৃত্য ("lackey of imperialism") রূপে। ষষ্ঠ কংগ্রেসে যখন এইভাবে তীব্র সমালোচনার তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে মানবেন্দ্রনাথের প্রতি তিনি তখন রোগ-মুক্তির উদ্দেশ্যে জারমানিতে। যাই হোক, এই সমালোচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্তালিন তথা কমিনটারনের বিরূপ মনোভাব যা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ১৯২৯ সনের ডিসেমবর মাসে যখন মানবেন্দ্রনাথকে কমিনটারন থেকে বিতাড়নের সংবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়। এইভাবে এক দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শেষ হয় মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের তৃতীয় পর্ব।

১৯৩০ সনের ডিসেমবর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের চতুর্থ পর্বের সূচনা। ভারতবর্ষে পৌঁছানোর ঠিক সাত মাস পরে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ১৯২৪ সনের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি রূপে অভিযুক্ত হন আদালতে। এই মামলায় শেষ পর্যন্ত তিনি ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং জেল থেকে মুক্তি পান ১৯৩৬ সনের ২০শে নভেমবর। লক্ষণীয় যে, কমিনটারন থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর থেকেই মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে মৌলিক রূপান্তর দেখা দিতে থাকে। যে ভারতীয় জাতীয় বুরজোয়া আন্দোলন সম্পর্কে তিনি

জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে সংশয় আর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এবং যার সংস্রব ত্যাগ করার জন্য তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর ১৯২৭ সনের খসড়া দলিলেও, আশ্চর্যের কথা, ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি সেই আন্দোলনেরই শামিল হয়ে পড়েন। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর দিনই, অর্থাৎ ১৯৩৬ সনের ২১শে নভেমবর, তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং সঙ্গে-সঙ্গে এ. আই. সি. সি-র সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় থেকে ১৯৪০ সনের অকটোবর মাস পর্যন্ত তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে। বস্তুত, ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে তিনি কংগ্রেসের সভাপতিপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন এবং আবুল কালাম আজাদের কাছে পরাজিত হন। অবশ্য একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে তিনি কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশকে সংঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী করে তুলতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে গান্ধীর নেতৃত্বকে তিনি চিরদিনই চিহ্নিত করেছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিনিধিরূপে। তাঁর আশা ছিল যে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে কালক্রমে যথার্থ সামাজিক বিপ্লবের লক্ষ্যে অগ্রসর হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে গান্ধীর নেতৃত্ব ব্যাপক গণ-সমর্থনের শক্তিশালী দুর্গে সুরক্ষিত এবং এই দুর্গে আঘাত হানা মানবেন্দ্রনাথের একক প্রচেষ্টায় স্বভাবতই ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। অন্যদিকে কংগ্রেসের যে পেটি-বুরজোয়া নেতৃত্বের প্রগতিশীলতায় মানবেন্দ্রনাথ বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন সেই পেটি-বুরজোয়া নেতৃত্ব ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই আপসের অন্ধগলিতে প্রবেশ করে। ফলত চল্লিশের দশকেই কংগ্রেসের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে মানবেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যান রাজনৈতিক বিফলতা তথা নিষ্ক্রিয়তার অচল বিন্দুতে।

রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং একাকিত্বে নিমজ্জিত মানবেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন এক সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনার। এই স্বপ্নই অনতিকালের মধ্যে রূপ নেয় এক নতুন দর্শনচিন্তায় যাকে তিনি অভিহিত করেন মৌল মানবতাবাদ (Radical Humanism) নামে। মানুষের মুক্তিই এই মানবতাবাদী দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা। এই মানুষ বলতে মানবেন্দ্রনাথ বোঝেন ব্যক্তিমানুষকে, যে মানুষ তার স্বকীয়তার সৌরভে তন্ময়, যে মানুষ এক মননশীল প্রাণী এবং এই মননশীলতার সাযুজ্যে যে সৃষ্টি করে তার নিজের জগৎ, যে মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং উন্নতির ওপর নির্ভর করে সমাজের কল্যাণ এবং প্রগতি। এক কথায়, মানবেন্দ্রনাথ তাঁর এই নতুন তত্ত্বে সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করেন ব্যষ্টির মহিমায় এবং তিনি এমন এক সমাজব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন যেখানে সমষ্টির সর্বব্যাপকতায় ব্যষ্টির অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মুক্তি সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের ধারণা স্বাভাবিকভাবেই চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। স্বাধীনতা তাঁর চোখে ব্যক্তিমানুষের সম্পূর্ণ বন্ধনহীনতা। তাঁর মতে, মানুষ যথার্থ স্বাধীন তখনই যখন সে সমস্ত রকমের সামাজিক এবং প্রাকৃত ও ভৌত জগতের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এক যুক্তিময় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। মানবেন্দ্রনাথ মনে করেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অথবা উদারনীতিবাদী সংসদীয় গণতন্ত্রে এই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্র বর্জনীয়, কারণ এই মতাদর্শ শ্রেণী-নামক এক কল্পিত সামূহিক সত্তার কাছে ব্যক্তিমানুষকে বিসর্জনের নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে সংসদীয় গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করে কার্যত ব্যক্তিমানুষকে নিষ্পেষ করা হয় অসহায় ক্ষমতা-হীনতায়। এই কারণেই মানবেন্দ্রনাথ পরিকল্পনা করেন এক প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যেখানে তৃণ-মূলের স্তর থেকে গঠিত হবে অসংখ্য জনগণের কমিটি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি শাখা দায়বদ্ধ থাকবে এই

কমিটিগুলির কাছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিত্যক্ত হবে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা যা সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণের অন্যতম মাধ্যম। জনগণের কমিটিগুলির দায়িত্বশীল সক্রিয়তায় গড়ে উঠবে এক আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষই অবাধে অগ্রসর হবে স্বাধীনতা এবং সত্যের লক্ষ্যে।

দুই

জীবনের বিভিন্ন পর্বে মানবেন্দ্রনাথ রায় যে বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব রচনা করেছিলেন যেগুলির অভিনবত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য। অর্থাৎ, তাত্ত্বিক হিসাবে মানবেন্দ্রনাথের মৌলিকতা সম্পর্কে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে রাজনৈতিক তত্ত্বের মূল্যনিরূপণে তার মৌলিকতাই একমাত্র বিচার্য বিষয় হতে পারে না। রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃত সার্থকতা তার নির্ভুল প্রয়োগের নিশ্চিত সম্ভাবনায়। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে আগ্রহী তাত্ত্বিককে তত্ত্ব এবং প্রয়োগের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনে তৎপর হতে হয়। বস্তুত, যে মার্কসবাদে একদিন মানবেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন তার অন্যতম শিক্ষা হল তত্ত্ব আর প্রয়োগের সুনিপুণ মেলবন্ধন। কিন্তু প্রয়োগে সিদ্ধিলাভ করতে গেলে তাত্ত্বিককে বিষয়গত অবস্থা সম্পর্কে নিরন্তর সচেতন থাকতে হয় এবং এই সচেতনতা গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হল সংশ্লিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে তাত্ত্বিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। দুর্ভাগ্য এই যে, তাত্ত্বিক মানবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রসদ ছিল নিতান্তই সামান্য এবং ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের মার্কসীয় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মূল গলদ এইখানে। ১৯১৫ সন থেকে ১৯৩০ সন পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে। এর সঙ্গে তাঁর কারাবাসের ছয় বছর যোগ করলে একথা বলা যায় যে সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে ভারতবর্ষের ঘটনাস্রোতে অবগাহনের কোনো সুযোগই তিনি পান নি। এর ফলে ভারতবর্ষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতা এবং বৈচিত্র্য ভেদ করে তার মর্মোদ্ধার করা তাঁর পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে যে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর মনীষা এবং বৈদগ্ধ্য দিয়ে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে চেয়েছিলেন। বিষয়গত অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞানে যতই তিনি অনুভব করেছিলেন নিজের স্বাভাবিক দুর্বলতা, ততই তিনি এই দুর্বলতাকে জয় করতে চেয়েছিলেন মনন এবং বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক সংকল্পের শক্তি দিয়ে। অর্থাৎ, বাস্তব জগৎ থেকে স্বনির্বাসিত মানবেন্দ্রনাথ বাস্তবকে নিজের আয়ত্তে রাখতে চেয়েছিলেন বুদ্ধির জাদুদণ্ড দিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি যে এই পদ্ধতি অবলম্বনের অনিবার্য পরিণাম হল হেগেলীয় ভাববাদী আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ। হেগেলের ভাববাদী জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা এই যে মানুষের মননের শক্তি অসামান্য, এবং এই শক্তির প্রাবল্যে মনন বিষয়গত অবস্থার অন্তরে মৌল রূপান্তর ঘটিয়ে বাস্তবকে নবরূপদানে সক্ষম। মূলত বুদ্ধিনির্ভর তত্ত্বের ওপর মানবেন্দ্রনাথের প্রবল আস্থা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তিনি কার্যত এই ধারণার বশীভূত হন এবং লক্ষণীয় যে তিনি যখন বস্তুবাদী মার্কসবাদী প্রত্যয়ে অনুপ্রাণিত তখনও তাঁর চিন্তার জগতে এই হেগেলীয় ভাববাদের ফল্গুস্রোত প্রবহমান। এই কারণেই তাত্ত্বিক মানবেন্দ্রনাথের মধ্যে বারে-বারে লক্ষ করা যায় বিষয়গত বাস্তবকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণের অনাগ্রহ। নিজের তত্ত্বে যুক্তিবাদ এবং রোম্যানটিকতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানকে তিনি উপেক্ষা করছেন নিতান্ত অবহেলায় এবং বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণে মনোগামিতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তৎপর হয়েছেন বাস্তবের রোমাঞ্চকরণে।

এই রোমাঞ্চকরণের সূত্রপাত ১৯১৯ সনে তাঁর গেল্‌স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রবন্ধে। মানবেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সনের ভারতবর্ষে প্রতিবাদ

আর বিক্ষোভের বিস্ফোরণকে সামগ্রিক বিদ্রোহাবস্থা বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ভাষ্য ছিল অতিরঞ্জিত। বিদেশী শাসকের চরম উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সেই সময়ের বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদী আন্দোলন যে অভূতপূর্ব ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে এই আন্দোলন ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক এবং এতে যুক্ত ছিলেন প্রধানত নিম্নমধ্যবিত্ত ও কারিগর শ্রেণী। দেশের বিপুলসংখ্যক কৃষকশ্রেণী এবং বহুলাংশে শিল্পশ্রমিকেরা এই আন্দোলনের শামিল হন নি। কাজেই এই আন্দোলনকে সামগ্রিক বিদ্রোহাবস্থার লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা অবশ্যই বাস্তবের রোমাঞ্চকরণ। অবশ্য যদি ধরে নেওয়া হয় যে এই বিবরণ পেশ করার সময় মানবেন্দ্রনাথ তাঁর পুরানো দিনের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী সত্তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে পারেন নি তাহলে এই রোমাঞ্চকরণ উপেক্ষা করা যেতে পারে, কারণ জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকের পক্ষে আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের দ্বারা তাড়িত হয়ে অতিশয়োক্তি করা নিতান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু মুশকিল বাধে যখন দেখা যায় যে মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদে দীক্ষিত হওয়ার পরও এই রোমাঞ্চকরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯১৯ সন থেকে দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাঁর পরিপূরক থিসিস পেশ করার সময় পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথ যে তত্ত্বের বৈধতায় নিঃসংশয় ছিলেন তা হল তাঁর সুবিখ্যাত বিশ্ব-ধনতন্ত্র ধ্বংসের এশীয় পথ সংক্রান্ত তত্ত্ব। একজন সচেতন ভারতবাসী হিসাবে মানবেন্দ্রনাথের পক্ষে এশিয়ার মুক্তি-আন্দোলনের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা অবশ্যই ছিল এক প্রত্যাশিত পদক্ষেপ। দ্বিতীয়ত, একজন মার্কসবাদী হিসাবে সঙ্গত কারণেই তিনি এশিয়ার উৎপীড়িত মেহনতি মানুষের সামাজিক মুক্তি প্রশ্নে বিচলিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু আপত্তি দেখা দেয় তখনই যখন এশিয়ার মুক্তির ব্যাপারটিকে তিনি ইয়োরোপীয় ধনতন্ত্র বিনাশের প্রাথমিক শর্ত রূপে চিহ্নিত করেন। কারণ এর দ্বারা তিনি জন্ম দেন এমনই এক অত্যুৎসাহী, রোম্যানটিক সূত্রের যা কার্যত অস্বীকার করে মার্কসবাদের মৌল তত্ত্বকে। মার্কসবাদ সাম্রাজ্যবাদের পটভূমিতে ধনতান্ত্রিক সমাজের বহির্দেশীয় সমর্থনব্যবস্থাকে তুচ্ছ করে দেখে না, অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক শোষণ যে ধনতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির কারণ, এ সত্য মার্কসবাদ অস্বীকার করে না। কিন্তু একই সঙ্গে মার্কসবাদ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ধনতান্ত্রিক শক্তির মূল উৎসে, যা নিহিত থাকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্কে। এই উৎপাদনসম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই মূলধনী শ্রেণী শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর শোষণ অব্যাহত রাখে এবং এই শোষণের দ্বারাই সুরক্ষিত হয় ধনতন্ত্রের অস্তিত্ব। ধনতন্ত্রের এই অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মানবেন্দ্রনাথ প্রতিরোধের দুর্গ গড়তে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র তার বহির্দেশীয় সাম্রাজ্যবাদী পটভূমিতে। অর্থাৎ, তিনি ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের চেয়ে বড়ো করে দেখেছিলেন তার বাহ্যিক দ্বন্দ্বকে। বস্তুত, তাঁর রোম্যানটিকতা এতদূর প্রসারিত হয়েছিল যে তিনি তাঁর পরিপূরক থিসিসে এমন যুক্তিও রেখেছিলেন যে ঔপনিবেশিক শোষণের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে ইয়োরোপীয় সমাজের মূলধনী শ্রেণী স্বদেশীয় শ্রমজীবী শ্রেণীর শ্রমশক্তির উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতে বিরত হবে। যদি মনে রাখা যায় যে মার্কসীয় বিচারে এই আত্মসাৎই হল ধনতান্ত্রিক শোষণের ভিত্তি, তাহলে মানবেন্দ্রনাথের এই তত্ত্বের সরলার্থ দাঁড়ায় এই যে ঔপনিবেশিক শোষণের কল্যাণে ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক সমাজে অভ্যন্তরীণ শ্রমজীবী শ্রেণী শোষণমুক্ত হবে। অর্থাৎ, এককথায়, মানবেন্দ্রনাথের এশীয় তত্ত্ব সম্পূর্ণ যুক্তিভ্রান্ত ও মার্কসবাদবিরোধী। সংগত কারণেই দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই তত্ত্ব বর্জিত হয়।

দ্বিতীয়ত, অ্যান ইনডিয়ান কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেসটো ও পরিপূরক থিসিসে দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা

সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ যে বিবরণী পেশ করেছিলেন তাতেও লক্ষ করা যায় তাঁর বাস্তবকে রোমাঞ্চকরণের প্রবণতা। ১৯২০ সনেই তিনি এই বিশ্লেষণ করেন যে ভারতবর্ষে বুরজোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি চলমান উৎপীড়িত শ্রেণীর সামাজিক মুক্তির বৈপ্লবিক আন্দোলন উন্নীত হয়েছে স্থিতিক্ষম (viable) পর্যায়ে। বস্তুত, তিনি মনে করেছিলেন যে ভারতবর্ষের তৎকালীন বিষয়গত অবস্থা প্রলেতারীয় বিপ্লবের অনুকূল। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস প্রমাণ করে যে তাঁর এই বিশ্লেষণ ছিল নিছক কল্পনাপ্রসূত। একথা সত্য যে ১৯১৯-২০ এই পর্বে ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে এবং বহু লক্ষ শিল্পশ্রমিক ধর্মঘটের শামিল হন; শুধুমাত্র ১৯২০ সনের প্রথমার্ধেই ভারতবর্ষে ছ-শ ধর্মঘট সংঘটিত হয় এবং এতে যুক্ত হন পনেরো লক্ষেরও বেশি শিল্পশ্রমিক। কিন্তু এইসব আন্দোলনে অনুপস্থিত ছিল যথোপযুক্ত শ্রেণীসচেতনতা এবং মতাদর্শগত লক্ষ্য ছিল নিতান্তই অস্পষ্ট। এ ছাড়া, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল পেটি-বুরজোয়া শ্রেণীর হাতে, যাঁদের এই জায়মান শ্রমিক-আন্দোলনকে শ্রেণীসংগ্রামের পথে পরিচালিত করার আগ্রহ এবং সামর্থ্য ছিল না। যে উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা টিলক ছিলেন প্রাথমিক পর্বে শ্রমিক-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, তাঁর সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণীবিশ্লেষণের সামান্যতম উপাদানও খুঁজে পাওয়া যায় না। আরও উল্লেখ্য যে, ১৯২০ সনের অগস্ট মাসে যখন সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এখন তার মঞ্চে কার্যত কোনো শ্রমিক-প্রতিনিধির স্থান ছিল না। তথাপি রোম্যান্টিক মানবেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তদানীন্তন ভারতবর্ষে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সমস্ত সম্ভাবনাই সমুপস্থিত। বস্তুত, এই স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়েই মানবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের জাতীয় বুরজোয়া শক্তির অবমূল্যায়ন করেছিলেন। ১৯২০ সনেই তিনি ভারতীয় বুরজোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। সংস্কারমনস্ক ও দ্বিধাগ্রস্ত জাতীয় বুরজোয়া শ্রেণীর আপসপ্রবণতা অবশ্যই অনস্বীকার্য। কিন্তু নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে এবং কখনও-কখনও অসামান্য নেতৃত্বের প্রভাবে ও ব্যাপক গণসমর্থনের আশায় এই বুরজোয়া শ্রেণীও অবতীর্ণ হতে পারে বৈপ্লবিক ভূমিকায়। বস্তুত, মানবেন্দ্রনাথ পরিপূরক থিসিস পেশ করার কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষে গান্ধী এই বৈপ্লবিক ভূমিকার ঐতিহাসিক নজির রাখেন। দূরদর্শী ও বাস্তববাদী লেনিন এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেছিলেন বলেই দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি জাতীয় বৈপ্লবিক শক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছিলেন এই বিবেচনায় যে কোনো-কোনো বিষয়গত অবস্থায় সংস্কারপন্থী বুরজোয়া ও বিপ্লবী বুরজোয়ার মধ্যে প্রভেদকরণ যৌক্তিক, বাস্তবসম্মত ও বাঞ্ছনীয়। এইজন্যই তিনি জাতীয় বৈপ্লবিক শক্তি, এই শব্দসমষ্টিকে শেষ পর্যন্ত পরিপূরক থিসিসের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বর্জন করেন বুরজোয়া শ্রেণী সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের ছুতমার্গীয় নীতি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রকৃতার্থে মানবেন্দ্রনাথের উগ্র রোম্যানটিকতার জয় হয় নি, জয় হয়েছিল লেনিনের উদ্যোগে যথার্থ মার্কসবাদী বিষয়মুখিতার।

মানবেন্দ্রনাথের বি-উপনিবেশনতত্ত্বেও বাস্তবকে কঠোরভাবে অনুসরণ না করে তাকে স্বীয় তাত্ত্বিক কাঠামোয় আবদ্ধ রেখে বাস্তবের নবরূপায়ণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯২৭ সনে ভারতীয় বুরজোয়া শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র প্রমাণ করতে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান। কিন্তু ইতিহাস এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে সাক্ষ্য দেয় না। একথা সুবিদিত যে প্রথম-যুদ্ধোত্তর যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির আবহাওয়া দেখা দেয়। কিন্তু শিল্পোন্নতির এই সক্রিয় উদ্যোগ যে যথার্থ শিল্পায়নের সূচক ছিল না, এ বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা একমত। বস্তুত, ষষ্ঠ কংগ্রেসেই কুসীনেন ও রিমেল (Remmele) মানবেন্দ্রনাথের

এই বিভ্রান্তির দিকে স্পষ্ট অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। তথ্যসংযোগে রিমেল প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতবর্ষে সেই সময় যে শিল্পোন্নতি ঘটেছিল তাকে শিল্পায়নের সমার্থক বলে ভাবা অবাস্তব এবং অনুচিত। তিনি সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছিলেন যে শিল্পায়ন ও শিল্পোন্নতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীনতাই মানবেন্দ্রনাথের বি-উপনিবেশন তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম কয়েকটি বছরে ভারতবর্ষে অভাবনীয় শিল্পোন্নতি দেখা দিলেও ১৯২২ সন থেকেই ভারতীয় শিল্প এবং অর্থনীতি মন্দায় আক্রান্ত হতে থাকে। কাজেই মানবেন্দ্রনাথ যে সময়ে তাঁর বি-উপনিবেশনতত্ত্ব পরিবেশন করেন সে সময়ে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতিও ব্যাহত। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯২৭ সনের কারেনসি আইন এবং ঐ সনেই ভারতীয় ইস্পাত সংরক্ষণ আইনের সংশোধন ব্রিটিশ রাজস্ব নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যে পরিবর্তন ভারতীয় বুরজোয়া শ্রেণীর সঙ্গে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের সম্ভাব্য সহযোগিতার পথ রোধ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবেন্দ্রনাথ যখন ভারতীয় বুরজোয়া শ্রেণীর সঙ্গে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের সুদৃঢ় সেতুবন্ধনের তত্ত্ব প্রচার করেন তখন তাকে বাস্তবের রোমাঞ্চকরণরূপে অভিহিত করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

আশ্চর্যের কথা এই যে, যে বুরজোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সর্ববিধ সংশ্রব পরিত্যাগ করার পরামর্শ মানবেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন ১৯২৭ সনেও, সেই বুরজোয়া শ্রেণীর সংগঠনেই তিনি প্রবেশ করেন ১৯৩৬ সনে এবং এইভাবে স্পষ্টতই লিপ্ত হন স্ববিরোধিতায়। মানবেন্দ্রনাথের এই ভ্রান্ত পদক্ষেপের জন্য দায়ী ছিল তাঁর মননের ওপর অতি-নির্ভরতা। সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য সাম্যবাদী গণ-আন্দোলনের পথে না গিয়ে তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেই নিজের প্রতিভাবলে তার চারিত্রিক রূপান্তর ঘটাবেন—এই আশা করেছিলেন। যে পেটি-বুরজোয়া নেতৃত্বকে তিনি নিজের চোখেই চীনে বিপথগামী হতে দেখেছিলেন সেই পেটি-বুরজোয়া শক্তিকেই তিনি এখন বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহারে উদ্যোগী হন। অর্থাৎ, বাস্তব থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে তিনি নিজের একক মননের শক্তি দিয়ে বাস্তবের পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বাস্তব ঘটনাপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই মনোবিলাসের উচ্চচূড়া থেকে নিক্ষেপ করে রাজনৈতিক রিক্ততার কঠিন ভূমিতে।

আরও বিস্ময়কর এই যে, যে মানবেন্দ্রনাথ ১৯২০ সনে উৎপীড়িত মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং যিনি জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন শ্রেণীসংগ্রামকে বিপ্লবে পরিণত করার পরিকল্পনায়, জীবনের শেষ পর্বে রচিত মানবতাবাদী দর্শনে তাঁকেই এখন উদ্বেল হতে দেখা যায় একক ব্যক্তিসত্তার মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। শ্রেণী তাঁর কাছে এখন বিপজ্জনক ধারণা, যেহেতু শ্রেণীর মধ্যে তিনি দেখেন ব্যক্তিসত্তার বিলয়ের সম্ভাবনা। একইভাবে সমাজ তাঁর চোখে এক বিমূর্ত ধারণা। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর মতোই তিনি মনে করেন যে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ব্যক্তির গাণিতিক সমষ্টিই হল সমাজ এবং এ ছাড়া সমাজের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। স্বভাবতই তাঁর মতে স্বাধীনতার কোনো সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত নেই, স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিনির্ভর। অর্থাৎ, স্বাধীনতা এক পরিবেশ-নিরপেক্ষ, সমাজ-নিরপেক্ষ, শ্রেণী-নিরপেক্ষ ও রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবস্থা যাতে সুনিশ্চিত হয় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলী এবং সম্ভাবনার বিকাশ।

মানবেন্দ্রনাথের এই তত্ত্ব শ্রুতিনন্দন ও রোমাঞ্চকর, কিন্তু বাস্তবানুগামী নয়। সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তার বৈভবের স্বপ্ন দেখা চলে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তির অবস্থান সমাজেরই পটভূমিতে। ব্যক্তিমানুষ কতকগুলি বিশেষ সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, তার আন্তর সম্ভাবনা তিল-তিল করে গড়ে ওঠে পরিপার্শ্বের অসংখ্য বৈচিত্র্যময় উপাদানের প্রভাবে। আবার

ব্যক্তির একক প্রয়াসে এই সম্ভাবনার বিকাশ সম্ভব নয়, এই বিকাশ ঘটে সমাজেরই সক্রিয় সাযুজ্যে। দ্বিতীয়ত, যদি ধরে নেওয়া যায় যে নিছক বন্ধনহীনতাই স্বাধীনতার শর্ত, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে এই তথাকথিত মুক্ত পরিবেশে ব্যক্তির প্রভুত্ব অপনোদন-এর গ্যারানটি কোথায়? মানবেন্দ্রনাথ মনে করেন যে ব্যক্তির উন্নত ও যুক্তিবাদী মননশীলতাই খর্ব করবে এই প্রভুত্বের প্রবণতাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের দোহাই দিয়ে এবং চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আদর্শের তাত্ত্বিক সুরক্ষায়, কেমন করে সম্পত্তি-সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থ প্রভুত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিমানুষ আগ্রাসী শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে—ইতিহাস সে বর্ণনায় মুখর। এই ঐতিহাসিক বাস্তবকে উপেক্ষা করে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর বিমূর্ত তাত্ত্বিক ভাবনায় তন্ময় হয়েছিলেন সম্ভবত এই কারণে যে এই তত্ত্বের সঙ্গে তিনি নিজের জীবনচর্যার নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করেছিলেন। বস্তুত, এক অর্থে দীর্ঘ রাজনৈতিক পথপরিক্রমার শেষে মানবেন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দর্শনে আশ্রয় গ্রহণ ছিল খুবই স্বাভাবিক, কারণ বলা যেতে পারে যে তাঁর রাজনৈতিক জীবন যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল তাঁর মানবতাবাদ মূলত সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই তাত্ত্বিক রূপায়ণ। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সততই বাস্তবকে আয়ত্তাধীন রাখতে চেয়েছিলেন বুদ্ধির শক্তি দিয়ে। কঠোর জ্ঞানতত্ত্বীয় বিচারে এর অর্থ যে হেগেলীয় ভাববাদে আশ্রয়গ্রহণ, সে কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর একটি অন্য ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। বলা যেতে পারে যে তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এই প্রজ্ঞায় প্রত্যয়ের দ্বারা যে তাঁর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তায় বাস্তবের প্রচলিত গতিপথে পরিবর্তন আনা সম্ভব। অর্থাৎ, মানবেন্দ্রনাথের অন্তরের নিভৃতে এই বিশ্বাস জন্মেছিল ব্যক্তিমানুষ তার একক প্রচেষ্টায় অসাধ্য সাধন করতে পারে। এই দীর্ঘ দিনের লালিত বিশ্বাসকেই মানবেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত এক দার্শনিক রূপ দেন তাঁর মানবতাবাদে। তাঁর নিজের নামের অন্তরালে অধিষ্ঠিত যে অসাধারণ ব্যক্তিটি এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে গিয়ে বারে-বারে ব্যর্থ হয়, সেই ব্যক্তিকেই মানবেন্দ্রনাথ এক মহিমান্বিত রূপ দেন তাঁর মানবতাবাদী দর্শনে। এই বিচারে মার্কসবাদ নয়, মৌল মানবতাবাদই ছিল তাত্ত্বিক মানবেন্দ্রনাথের যথার্থ মানসপ্রতিমা।

ফুটন্ত

নিখিলকুমার নন্দী

সেই আনন্দ দিয়েছিলে যার মধ্যে কয়েক ফোঁটা অশ্রু;
শুক্তির মধ্যে মুক্তোর মতো নয়,
ঘাসে-ঘাসে শিশিরবিন্দুর মতো
সচরাচর যা আছে, ছিল, ঝরেছিল বিশেষত সেই ভিকটোরিয়ার নিশীথিনী পথে;
আজও দেখতে-দেখতে আসি-যাই, কোনো চিহ্নই কি আছে?
নেই, থাকে না।

অথচ বিদায় বললেই সবটা তার সব-হারানো নয়;
যে-রুমাল নাড়লে তার ক্ষীণ প্রান্তে তবু একটি বলিষ্ঠ গিঁট অদৃশ্য:
'ভুলব না'
বল নি একবারও, কিন্তু মনের তলায়
ছলছল জল এখনও শুকোয় নি, প্রতিবিম্ব নড়ছে: তোমার পাশে আমারও;
অস্বীকার করতে পার?

তাই বলছিলাম:
তদবধি মঙ্গে, জুয়ায়, জাঁতাকলে—জীবন কত কী দেয়, কত কী নেয়—
ঘুরতে-ঘুরতে চুঁড়তে-চুঁড়তে চুঁটো জগন্নাথ হতে-হতেও
ফিরে দাঁড়িয়ে, রুখে,
এখনও রক্তওঠা গলায় গান আসে, এখনও নীরন্ধ্র অন্ধকারে
চাল্‌সে-ধরা চোখ ঠুকতে-ঠুকতে এগিয়ে এসে
কয়েক পা পিছিয়ে যায় খানাখোঁদলের পাতি রাস্তায় বা
রাজপথে:
গন্ধ আসে কীসের? কার?
জুঁই, হেনা, বকুলের? কামিনীর?
তার?
কী করে ফুটল, এখানে? আজও? এখনও?

আজ তাই সে-আনন্দই দিতে চাই তোমাকে
যার মধ্যে কয়েক চাপ রক্ত
গলনালী থেকে, শ্বাসযন্ত্র থেকে, নাভিদেশ থেকে
আমার এতাবৎ সংকট, সংগ্রাম, সংঘাত
এবং আত্মহননেচ্ছার আবর্ত থেকে
পাথরচাপা ছলছল সত্তার পাতাল থেকে যা উঠে এসেছে;
মচকে দিয়েছে, তবু ভাঙতে পারে নি—অথচ তো চকচকে রক্ত।

আমার যাবতীয় দ্বন্দ্ব, অস্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ
আছে, তাই আছি
বাইরে নিস্তাপ, প্রায় ঠাণ্ডা;
ভিতরে ফুটছে :
তোমার গলিত অশ্রু ও আমার বিচলিত রক্ত,
আর এই মহানাগরিক জনারণ্যে
ঝনঝন যানবাহন, টানটান জগঝম্প
ও জগৎবরেণ্য ভুয়ো-জুয়োজালিয়াতি-মিথ্যালোড়নের
খাস-আম দরবারের নড়বড়ে হড়হড়ে দরকারে
অন্য যত অনটনই থাক,
গরম বাষ্পের কোনো অভাব নেই!

উভচর

শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী

আবার এসেছে বিজয়া দশমী, আবার ভাসান
সাকার প্রতিমা দিয়ে আসি নদীজলে,
জলে রূপ গলে, তাল-তাল পলি
হাতে মাখামাখি, দু-পায়ে জড়ায়,
আমাকেও যেন টেনে নিতে চায় অতলে—

জল-বিলোপন ছেড়ে উঠে আসি স্থলে,
ঘাটলার শান, ধাপ-ধাপ সিঁড়ি, জীর্ণ দেউল···
খরটান থেকে পলির স্মরণ
নিয়ে আসে দেহ ভেতরে-চারানো নশ্বরতায়,
বারবার নামি স্থল থেকে জলে
জল থেকে ফের উঠি
নির্বাণ থেকে অবিরত নির্মাণে।

কাশীনাথপুরের মেয়েরা

মাসুদ খান

কাশীনাথপুরের মেয়েরা বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজে
স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে।

পথের দুপাশ ধরে অন্যমনস্ক বাবলার সারি
তাদের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে,
জাম ও জামরুলদের বসতবাড়ি পার হয়ে
দুহাতে মেঘলা বাতাস কেটে-কেটে
পাখিদের মতো তারা বাড়ি ফিরে আসে।
কাশীনাথপুরের মেয়েরা বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজে
স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে।

জানি না, স্কুলে কেন যায় তারা
শুধু জানি, ওই কাঠবেড়ালি মেয়েগুলো একদিন ঋতুমতী হবে
একটু-একটু করে শিখবে জীবনের ফলিত রসায়ন
তারপর তারা বিশ শতকের বিষণ্ন হাওয়ায়
অন্তমাখা মেঘ-মেঘালিতে মিশে যাবে
পরদিন বৃষ্টি হয়ে ঝরবে অঝোরে
ইছামতী নদীজলে, পাখিদের ছিমছাম আঙিনায়
পড়শির স্মৃতি-তরঙ্গিত টিনের চালে।

ওই মেয়েগুলো সত্যি-সত্যি একদিন মেঘ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ

শালবনে সন্ধ্যা

ফারুক আলমগীর

বনের বসত দোলে বিকেলের চিরল রোদ্দুরে
দীর্ঘতর হয় ছায়া, হরিণের মাংসের স্বেদ
বৃক্ষদের কাছে জমা রেখে সূর্য চলেন পশ্চিমে
সঙ্গে চলছে দ্রুত লজ্জাবতী গারোদের মেয়ে
কনে-দেখা আলো মেখে যেতে হবে বনের উপান্তে
কার্তিকের শিশিরে পায়ের সঙ্গে উঠে আসছে
ঘাসের ঘুমেল গন্ধ, এইমাত্র কাঁচুলি জড়িয়ে
চট করে চাঁদ ওঠে মধুপুর শালের দিগন্তে
বৃক্ষের সান্নিধ্যে সান্ধ্য-প্রার্থনার শান্ত নিঃশ্বাসে
বেজে ওঠে কোনো এক অলৌকিক প্রভুর উপমা
চাঁদের আলোয় শিশুদের নৃত্য চোর-চোর খেলা
জননীরা নির্মোহ বনানীর তুমুল অভিসারে

বিকল-শকট দীর্ঘতর করে বনের মুহূর্ত
বৃক্ষদের অনুভবে সদাস্থিত নির্ঝরসংগীত

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ষোল

বেগমাতে সাইয়োয়া

মেজবউবিবি দিলরুখ ওরফে রুকু বেগমের গর্ভজাত শিশুটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন সাইদা বেগম। তাঁর বুজুর্গ স্বামী এই শিশুর জন্মের সময় ইসলামি কানুন অনুসারে তার দুই কানে আজান দিতে আসেন নি, অথচ সাতদিন পরে খৎনা (circumcision) এবং আকিকা (নামকরণ) অনুষ্ঠানে তাঁর খিদমতগার আলি বখ্‌শ্‌ মারফত একটুকরো কাগজ পাঠান। ওতে বাঙলায় বড়ো-বড়ো হরফে 'কামরুজ্জামান' শব্দটি লেখা ছিল। সাইদা কাগজটি পড়েই ছিঁড়ে ফেলেন। দৃঢ় কণ্ঠস্বরে বলেন, আয়মনি, আলিবখ্‌শ্‌কে বলে দাও, বাচ্চার নাম রাখা হয়েছে রফিকুজ্জামান। আলি বখ্‌শ্‌ বিবিসাহেবার উদ্দেশে সালাম জানিয়ে এবাদত-খানায় ফিরে যায়। আর আয়মনি পা ছড়িয়ে বসে শিশুটিকে তেল-হলুদ মাখাতে-মাখাতে সুর ধরে বলতে থাকে, 'সোনামানিক রফিরে। বড়ো কবে হবি রে। চাচা চুঁড়তে যাবি রে। রফর চাচা শফি রে ' গ্রাম্য মেয়েদের এই রীতি প্রথাসিদ্ধ। তারা অনর্গল অনুরূপ বাক্যনির্মাণে পটু। এভাবেই গ্রাম্য ছড়াগুলি অসম্বদ্ধতা থেকে বিমূর্ত সম্বদ্ধতায় উত্তীর্ণ হয়। আয়মনি শিশুটিকে কেন্দ্র করে ছড়া গেয়ে-গেয়ে একটি শিল্পবৃত্ত গড়ে তুলত, যার মধ্যে এক বন্ধ্যা স্বামী-ত্যাগিনী ও সাহসিকার জোরালো স্নেহ ছিল, হৃদয়-নিঃসৃত কোমলতা ছিল। আয়মনি শিশুটিকে পেয়ে আত্মভোলা। কিন্তু সাইদা বেগম সবসময় পরীক্ষা করে দেখতেন, শিশুটির মধ্যে তার প্রতিবন্ধী জনকের কোনো বৈলক্ষণ্য আছে কি-না। মনিরুজ্জামানের শৈশবকে মিলিয়ে দেখতেন সাইদা। অবশেষে নিঃসংশয় হন, শিশুটির মধ্যে শারীরিক এবং মানসিক স্বাভাবিকতা আছে। এর পর থেকে আত্মঘাতিনী বেহান দরিয়ানুর স্মৃতিকথায় তিনি তাঁর সংসার জুড়ে প্রতিধ্বনি তুলতে

থাকেন। রুকু বিব্রত বোধ করত। মায়ের স্মৃতি তার অসহ্য ছিল। সাইদা কান্নাজড়ানো স্বরে বলতেন, বেহানসাহেবার জন্য হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে খোদাকে বলব, আমার আজকে নেকির (পুণ্য) বদলে ওকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও! সাইদা একথা বলতেন এবং আন্তরিক এই প্রতিশ্রুতির কারণ, আত্মঘাতীদের জন্য সুনিশ্চিত দোজখ। রুকুও নামাজ ও কোরান-পাঠের পর মনে-মনে তার আত্মঘাতিনী মায়ের জন্য নিজের পুণ্যের অর্ধাংশ দান করতে চাইত। শিশুটির প্রতি তার যেন কিছু উদাসীনতা ছিল। শাশুড়ি বা আয়মনি তাড়া না দিলে ক্রন্দনরত রফিকে সে বুকের দুধ খাওয়াতে চাইত না। সাইদা ভাবতেন, মেজবউ-বিবির বালিকাদশাই এর কারণ। তাঁর জীবনেও এমন ঘটেছিল। শাশুড়ি কামরুন্নিসা বেগমই তাঁর তিনপুত্রকে লালনপালন করেছিলেন। আয়মনি বলত, ক্রিমে-ক্রিমে সব জানবে গো! এই সেদিন ন্যাংটো মেয়ে দেখেছি দুই বহিনকে। এখন দেখছি বেটার মা। শিশুটির বয়স ছ মাস হলে সাইদা আর আয়মনি একটি গোপনীয় কাজ করেন। গভীর রাত্রে শিশুর মঙ্গল-কামনায় পরিত্যক্ত খোঁড়া পিরের মাজারে সিন্নি দিতে যান। শিশুটিকে নিয়েই যান। তার শরীরে ঘুমন্ত অবস্থায় মাজারের ধুলো মাখিয়ে দেন। গোপনীয়তার কারণ, টের পেলে ফরাজি-মৌলাহাটে ছিছিক্কার পড়ে যাবে! ওঁরা ফিরে না আসা পর্যন্ত রুকু খিড়কির দরজায় উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু গ্রামজীবনে কোনোকিছু গোপন থাকে না, এটাই আশ্চর্য! গ্রাম প্রকৃতির করায়ত্ত এবং প্রকৃতি সহস্রলোচন সত্তা—এ ছাড়া পরবর্তী ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে না। কীভাবে রটে যায়, ফরাজি ধর্মগুরুর বিবিসাহেবা প্রাচীন যুগের এক সুফি পিরের দরগায় সিন্নি দিয়েছেন। প্রত্যুষে নতুন মাটির মালসায় রাখা কিছু বাতাসা, খই এবং মাটির ঘোড়া (আয়মনির ঘরে প্রাক-ফরাজি আমলের এই খুদে ঘোড়াগুলি ছিল) অনেকের চোখে পড়ে। হইচই শুরু হয়ে যায়। হুজুরের কাছে খবর যায়। পরবর্তী জুম্মাবারে হুজুর বহুদিন পরে মসজিদে গমন করেন। এদেশের মসজিদ পূর্বমুখী। পশ্চিমদেয়ালের মাঝখানে একটি ত্রিকোণ কোটরসদৃশ খিলান থাকে, যার ঊর্ধ্বাংশ ফুলের পাপড়ির মতো। কোটরে কাঠের একটি মিমবার (বেদি) থাকে, যার তিনটি ছোট্ট ধাপ আছে। ফরজ (আবশ্যিক) নমাজের পর নমাজ-পরিচালক ইমাম (যিনি খতিব নামেও অভিহিত হন এবং এই কাজটি যে-কোনো ইমানদার মুসলিমই করার অধিকারী) ওই মিমবারে বসে ধাপে পা রেখে 'খোৎবা' (শাস্ত্রীয় ভাষণ) পাঠ এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। তো সেই জুম্মাবারে হুজুর বদিউজ্জামান স্বয়ং খোৎবা-পাঠের সময় কেতাবটি হঠাৎ বন্ধ রেখে আগেকার বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বরে বলে ওঠেন, মোনাফেক (ভ্রান্ত মুসলিম—যোগরূঢ়ার্থে) কলঙ্ক-রটনাকারীদের প্রতি আল্লাহের লানৎ (অভিশাপ)! যারা যা দেখেছে, তারা শয়তানেরই কারবার দেখেছে। শয়তান আউরতের চেহারা ধরতে পারে। শয়তানের সাগরেদ কালা জিনেদের ডেরা ওই খোঁড়া পিরের মাজার। নাউজুবিল্লাহ্‌! ওই পিরেরা নিজেদের সুফি নামে জাহির করত। ওরা ছিল ভণ্ড। ওদের একজন মনসুর হাল্লাজ বলত, 'আনাল্‌ হক! আমিই খোদা।' তওবা নাউজুবিল্লাহ্‌! হুজুরের এই বাণী উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে সারা মসজিদ, মসজিদ থেকে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণ থেকে সড়ক পর্যন্ত প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি ওঠে, তওবা নাউজুবিল্লাহ! আর সেই জুম্মাবারে নামাজের পর ফরাজি মুসলিমরা কোদাল আর গাঁইতি হাতে ছুটে যায়। খোঁড়া পিরের মাজারটি ব্রাহ্মণী নদীর পিরের সাঁকোর মতোই ধ্বংস করা হয়। এমন-কি কাঠ-মল্লিকার পুষ্পবতী গাছটিও টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। শুধু বটগাছটি তার বিশালতাহেতু অক্ষত থাকে। কথিত আছে, ওই জুম্মাবারে মানুষের চেহারায় বিস্তর শাদা জিনও উপস্থিত ছিল। অদূরে অবস্থিত হানাফি-গ্রাম অছিপুরের লোকেরা যদি বাধা দিতে আসত, শাদা জিনেরা তাদের আসমানে ছুড়ে মারত, তাতে

কোনো সন্দেহ নেই। এই ঘটনার পর আরেকটি ঘটনা ঘটে, যা আরও বিধ্বংসী শুধু নয়, অকল্পনীয়ও বটে। তবে প্রাসঙ্গিক একটি ক্ষুদ্র তথ্য আছে। খোঁড়া পিরের মাজার ধ্বংসের দিন সন্ধ্যার পরে হুজুরের পবিত্র হাতে লেখা এক টুকরো পবিত্র কাগজ আলি বখ্‌শ্‌ দিয়ে যায় সাইদাকে। আয়মনি সেটি সাইদাকে দিলে তিনি ছুড়ে ফেলেন। বর্ডবিবি রুকু বেগম সেটি কুড়িয়ে নেয়। ওতে লেখা ছিল: "বেদা'য়াতে সাইয়্যেয়া অতিশয় গোনাহের কাজ। সেই কাজগুলি হইল: কবরে সিন্নি মানত, কবরে নামাজ পাঠ, মাজার অথবা দরগাহ্‌ নির্ম্মাণ। আমার ইন্তেকাল হইলে যেন এই-গুলি না ঘটে।"…

হাফিজ ইন খির্কা কি দারি তু বিবিনি ফরদা
কি চি জুন্নার জে জের-অশ্‌ ব জফা বিকুশায়েদ

পুকুরের বাঁধাঘাটে বসে ছোটোগাজির কেতাবখানি পড়ছিলাম। 'দিওয়ানে হাফিজ' আমাকে চিন্তারূপী শয়তানের হাত থেকে মাঝে-মাঝে রক্ষা করে। আজ দিনভর উপদ্রব গেছে। উপদ্রবই বলা উচিত। বড়োগাজির সঙ্গে একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক এসেছিলেন। বড়োগাজি তাঁর পারচয় দিলেন মৌলবি আফতাবুদ্দিন আহমদ বলে। মৌলবি লোকটি নাকি বহু ভাষা- ও শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত। তিনি হিন্দুশাস্ত্রও নাকি এতখানি জানেন, যা তামাম হিন্দুস্তানে কোনো ব্রাহ্মণপণ্ডিতও জানেন না। আমি বললাম, মারহাবা! আংরেজি শিখে নাসারা আংরেজকে বরবাদ করতে হবে। তেমনি বুত্‌-পরস্ত্‌ (পৌত্তলিক) এলেম শিখে হিঁদুদের ভুল ঘোচাতে হবে। আফতাবুদ্দিনকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। বললেন, জনাবে হজরত! খ্রীষ্টান-দের মতোই হিন্দুরা পথভ্রষ্ট। বুত্‌-পরস্তি অনার্যদের ধর্ম। প্রকৃত হিন্দুধর্ম আর্যধর্ম। সেই ধর্মের কেতাবের নাম বেদ। বেদে বলা হয়েছে, পরম স্রষ্টা নিরাকার। তিনি একজন মাত্র। ইসলামের মূলতত্ত্বের সঙ্গে বৈদিক মূলতত্ত্বের এতটুকু ফারাক নেই। উপনিষদ নামে কেতাব আছে। তা বেদের ব্যাখ্যা। তাই এগুলানকে বেদাঙ্গ বলা হয়। আপনি কি রাজা রামমোহন রায়ের নাম শুনেছেন? তিনি ইসলামি এলেমে সু-পণ্ডিত ছিলেন। বড়োগাজি তাঁর কথার মধ্যে বলে উঠলেন, রাজা ব্রাহ্মধর্ম নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে গেছেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে মুসলমানদের বহু বিষয়ে মিল আছে। এই সময় আমি বললাম, দেখুন মৌলবিসাহেব! আল্লাহ পাক মনুষ্যগণের পথ-প্রদর্শনের জন্য এক লক্ষ সত্তর হাজার পয়গম্বর পাঠিয়েছেন দুনিয়ায়। শেষ পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ (সাঃ)। আর দেখুন, ঐশী কেতাবের সংখ্যা মাত্র চার। তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল এবং ফুরকান (কোরান)। এগুলানকে আহ্‌লে কেতাব বলা হয়। আপনার বেদ কখনও আহ্‌লে কেতাব নয়। আফতাবুদ্দিন বললেন, হুজুরে আলা! আপনি সুবিজ্ঞ আলেম। আপনি কি মনে করেন, হিন্দুস্তানের কোটি-কোটি লোকের জন্য আল্লাহ্‌ কোনো পয়গম্বর পাঠান নি এবং কোনো ঐশী কেতাব অবতীর্ণ হয় নি? ধূর্ত ও আমুদে বড়ো-গাজি মুখ টিপে হেসে বললেন, ভাববার কথা। এরপর আফতাবুদ্দিন হিন্দুদের মতো বিস্তর সংস্কৃত শ্লোক আওড়ে তার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। আমি বললাম, মৌলবিসাহেব, আপনি মুসলমান না ব্রাহ্ম? আফতা-বুদ্দিন ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বললেন, দুনিয়ায় আল্লাহের ধর্ম একটাই। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বিভিন্ন নাম। হিন্দুস্তানে তাঁর নাম ব্রহ্ম। আরবে তাঁর নাম আল্লাহ। তাই আমি নামাজ পড়ি, আবার ব্রহ্মোপাসনাতেও যোগ দিই। বড়োগাজি বললেন, নুরপুরের তল্লাটে এক জমিদার নয়া আবাদ পত্তন করেছেন। তিনি ব্রাহ্ম। সেই আবাদে ব্রাহ্মদের বড়োঘাঁটি। আফতাব সাহেবের বাড়ি নুরপুরে। আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে রূঢ় স্বরে বললাম, আপনি ব্রাহ্ম না মুসলমান? আফতা-বুদ্দিন একই ভাবে জবাব দিলেন, যিনি আল্লাহ তিনিই ব্রহ্ম। আরও রূঢ় স্বরে বললাম, আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন? আফতাবুদ্দিন বিব্রতভাবে বললেন, হিন্দুস্তানের বর্তমান অবস্থায় ব্রাহ্ম ও মুসলমানদের ঐক্য প্রয়োজন। ব্রাহ্ম হিন্দুরা মুসলমানদের বেরাদর (ভাই) বলে জানেন। আপনাকে জানানো উচিত, ব্রাহ্ম পণ্ডিত-দের কেউ-কেউ পাক হাদিস কেতাবগুলান বাঙলায় অনুবাদ করছেন। পাক কোরানও অনুবাদ করার প্রস্তাব আছে। মাঝে-মাঝে কলিকাতা গিয়ে সেই কাজে আমি তাঁদের সাহায্য করি। আমার ইচ্ছা, হিন্দুরাও জানুক ইসলাম কী। আমি বড়ো-গাজির দিকে চোখ রেখে বললাম, এই কাজের জন্য মুসলমানের হিন্দু হওয়ার দরকার নেই। গাজিসাহেব! আপনার এই দোস্ত (বন্ধু) শয়তানের পাল্লায় পড়েছেন। ঐঁকে এখনই আমার এবাদতখানা থেকে নিয়ে যান। বড়োগাজি তৎক্ষণাৎ 'মৌলবী'-খেতাব-ধারী লোকটিকে ইশারায় উঠতে বললেন। দুজনে বেরিয়ে গেলে আমি প্রাঙ্গণে নেমে পায়চারি করতে থাকলাম। বহু বছর আগে ঠিক এভাবে একজন আংরেজ পাদ্রি আমার কাছে এসেছিলেন। তিনিও বোঝাতে চেয়েছিলেন, খ্রীষ্টান আর মুসলমান বেরাদর! দুনিয়ায় শয়তান কত চেহারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! বিকেল পর্যন্ত আমার আস্থিরতা ঘুচল না। আশঙ্কা হচ্ছিল, বড়োগাজি শয়তানের পাল্লায় পড়লেন কি না! পুকুরঘাটে বসে 'দিওয়ানে হাফিজ' কেতাবের পাতা ওলটাচ্ছি, সেই সময় চোখে পড়ল এই বয়েতটি:

'হাফিজ ইন খির্কা কি দারি তু বিবিনি ফরদা / কি চি জুন্নার জে জের-অশ্‌ ব জফা বিকুশায়েদ…' তওবা, তওবা! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

হাফিজের এই পোশাক যদি টেনে খুলে ফেল /
দেখবে তার তলায় আছে যজ্ঞোপবীত…

ভাবলাম দিনশেষে শয়তান এই সুন্দর কেতাবের হরফ বদলে দিয়ে জঙ্গলের কালো ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে। দ্রুত পাতা উলটে শেষদিকের একটি বয়েতে চোখ রাখলাম।

হর হল্‌কা এমঘান্‌ আম্‌ আন্‌ পিসর্‌ চে খোস্‌ গুফ্‌ত-
ব কাফিরান্‌ চে কার্‌ অত্‌ গর্‌ বুত্‌ না মি পরস্তি…

তওবা, তওবা! এতদিন এ কোন্‌ কেতাব পড়ে তারিফ করে আসছি? কামিজের তলায় কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন বেরিয়ে পড়ল এবার। এই হাফিজ লোকটি নিশ্চয় সুফি ছিল। সুফিরা মুসলমান-ভেকধারী মোনাফেক!

অগ্নিপুজক মঘদের মজলিশে ওই বালক /
কী চমৎকার কথা বলে উঠল /
'যদি না শিখতে পারলে মূর্তিপূজা /
কাফেরদের সংস্পর্শে এসে কী লাভ হল বলো'…

কেতাবখানি পুকুরের পানিতে ছুড়ে ফেললাম। ইচ্ছে করল, এ মুহূর্তে ছোটোগাজি সামনে থাকলে ওই নাদানকে চল্লিশ পয়জার মারতাম। আলি বখ্‌শ্‌ সবসময় আমার দিকে নজর রাখে। সে দৌড়ে এসে পাংশু মুখে শুধু বলল, হজরত! বললাম, কিছু নয়। সে অবাক, ভীত চোখে পানির দিকে তাকিয়ে ছিল। ছড়িটি তুলে বললাম, অ্যাই কমবখ্‌ত্‌! এখানে কিছু দেখার নেই। ভাগো! সে মুখ নীচু করে চেলে গেল। একটু পরে ওকে লবণ, কালা জিনের মুখে কেতাব ছুড়ে মেরেছি। তাহলে ও খুবই খুশি হবে। আসলে মানুষের এই স্বভাব, চারপাশের সবকিছুতে অলৌকিককে চুঁড়তে চায়। মোজেজা অন্বেষণ করে। ওরা ভাবে, এই মাটির দুনিয়াই কি সব? ঠিকই তো। মাটির দুনিয়া নিশ্চয় সব নয়। পানির তলার ওই প্রতিবিম্বের মতো অনেক কিছু আছে। তা জানার জন্য ইল্‌ম্‌ (প্রজ্ঞা) অর্জন করা চাই। কিছুক্ষণ পরে আলি বখ্‌শ্‌ ফের এসে বলল, আনিসুর সর্দার, আরও জনাকতক হুজুরে আলার সঙ্গে করতে এসেছেন। ভাবলাম, এই আস্থিরতা ঘোচানোর জন্য কিছু হালকা গল্পগুজব করা দরকার। ওদের কাজ যত জরুরি হোক, আমি পাত্তা দেব না। বললাম, ওঁদের এখানে নিয়ে এসো। মৌলাহাট জামাতের মুরুব্বি লোকগুলি সম্ভাষণ করতে-করতে ঘাটে এলেন। ওঁদের বসতে

বললাম। বিপরীত দিকের চত্বরে ওঁরা বসলেন। তারপর আনিসুর কিছু বলতে মুখ খুলেছেন, আচানক সড়কের দিক থেকে বাঁশির সুর ভেসে এল। সঙ্গে-সঙ্গে দুই কানে আঙুল গুঁজে বললাম, কে ওই শয়তান আমার চল্লিশ দিনের বন্দেগি (তপজপ) বরবাদ করল ? ওকে জলদি পাকড়াও।…

নুসাইবা নামে এক নারী

দিলরুখ বেগম ॥ কচি, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি রে ?

কচি ॥ না, না, না ! বলো না, শুনছি। রোজ বলি, অত হুঁ দিতে পারব না !

দি বেগম ॥ শাশুড়িসাহেবার কাছে শুনেছি, পয়গম্বরের জমানায় আরবে এক তেজি আউরত ছিলেন। তাঁর নাম ছিল নুসাইবা খাতুন। খোদা জিব্রাইল ফেরেশতার মারফত পাক কোরানের সুরা (অধ্যায়) পাঠিয়ে দিতেন। পয়গম্বর সেইগুলান মুখস্থ করতেন। পরে মজলিশে তা মোমিনদের শোনাতেন। তো একদিন নুসাইবা খাতুন রাগ করে পয়গম্বর হুজুরকে বললেন, হজরত ! খোদা কেন শুধু পুরুষ-মানুষদের লক্ষ করে কথা বলেন ? মেয়েরা কি মানুষ নয় ? আদমের বাঁ পাজর থেকে আমাদের তিনি তৈয়ার করেছেন। তাহলে কেন খোদা আমাদের লক্ষ করে পয়গাম (বার্তা) পাঠাচ্ছেন না ?

কচি ॥ মার্ভেলাস ! তারপর দাদিমা, তারপর ?

দি বেগম ॥ শাশুড়িসাহেবা বললেন, তারপর থেকে খোদার পয়গামে 'মুসলিমান ওয়া মুসলিমাত্' কথা দুটো আসতে লাগল।

কচি ॥ তার মানেটা কী বলবে ?

দি বেগম ॥ বুঝলি নে ? পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষ দু তরফকে লক্ষ করে খোদার পয়গাম এল। পাক কোরান পড়ে দেখিস। মর্দানা-আউরতখোদার কাছে সমান। কেউ ছোটো, কেউ বড়ো নয়।

কচি ॥ হঠাৎ নুসাইবার কথা কেন, দাদিমা ? রাখালছেলেটার কী হল ?

দি বেগম ॥ ছেলেটার নাম ছিল ফজু। বাপ-মা কেউ ছিল না। আমাদের সংসারের কাজকাম দেখাশুনা করত দুখু। তারই ভাগ্নে। তখন বয়স বোধ করি নয়-দশ বছর হবে। আমাদের একটা বাঁজা গাইগোরু ছিল। তার নাম মুন্নি। ভাসুরসাহেব কতবার এসে সাধাসাধি করতেন, কোরবানিতে মুন্নিকে হালাল করি। শাশুড়িসাহেবা চোখমুখ লাল করে ভাগিয়ে দিতেন। তো মুরিদরা (শিষ্যরা) একটা দুধেল গাই দিয়েছিল। তার নাম আমি 'কাজলি' রেখেছিলাম। তার গায়ের রঙ ছিল কাজলা।

কচি ॥ আহা, রাখালছেলেটা—

দি বেগম ॥ বলছি তো ! আমাদের একটা ছাগলও ছিল। তার নাম ছিল কুলসুম। ফজু সেই মুন্নি, কাজলি আর কুলসুমকে চরাতে নিয়ে যেত। ছেলেটা ছিল ভারি রগুড়ে। শালিকপাখি পুষেছিল। তার জন্য বাঁশের খোলে করে নদীর ওপার থেকে ঘাসফড়িং ধরে নিয়ে আসত। আর ওই এক শখ বাঁশি বাজানো।

কচি ॥ এক মিনিট দাদিমা ! রাখালছেলেরা বাঁশি বাজাবেই। কেন বলো তো ?

দি বেগম ॥ মাঠেঘাটে ঘোরে দিনমান। সময় কাটাতেই বোধ করি বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়।

কচি ॥ দারুণ বলেছ ! তবে আমার মনে হচ্ছে কী জান ? প্রকৃতির মধ্যে গেলে মানুষ একা ফীল করে—লোনলি ফীলিংস ! অথবা—প্রকৃতিতে সারাক্ষণ সুর বেজে চলেছে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পদ্যে পড়েছি। সেই সুরকে মানুষ, মানে রাখালছেলেটা, মানে তোমাদের ফজু বাঁশিতে নিতে চাইত। প্রতিধ্বনির মতো ! Whose heart-strings are a lute !

দি বেগম ॥ নিজেই বকবক করবি, নাকি গল্পটা শুনবি ?

কচি ॥ সরি ! বলো, তারপর কী হল ? তোমার বিক্রমশালী শ্বশুর রাখাল বেচারাকে কুলগাছে বেঁধে জুতো মারছিলেন। শ্রদ্ধাভক্তি আর রইল না বাবা ! ভ্যাট্ !

দি বেগম ॥ উনি ফরাজি আলেম ছিলেন। মৌলাহাটে সে-জমানাও ছিল আলাদা। তো ফজুকে উনি এবাদতখানার উঠোনে কুলগাছে বেঁধে রেখেছেন। বাঁশিটা ভেঙে পুকুরের পানিতে ফেলেছেন। সেই খবর এল যখন, তখন শাশুড়িসাহেবা মগরেবের জন্য বদনায় পানি নিয়ে অজু (প্রক্ষালন) করতে যাচ্ছেন। আমি তোর আব্বাকে তোর দাদাজির কোলে দিয়ে বদনা হাতে নিয়েছি। হেন সময়ে দুখু কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ঢুকল। শাশুড়িসাহেবার হাত থেকে বদনা পড়ে গেল। শুধু পলকের জন্য দেখলাম, বেপরদা হয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কচি ॥ তারপর দাদিমা, তারপর ?

দি বেগম ॥ তখনও দিনের আলো আছে। বাদশাহি সড়ক ধরে ছুটতে-ছুটতে—

কচি ॥ ছুটতে-ছুটতে ?

দি বেগম ॥ যারা দেখেছিল, তারা বলেছিল। তবে মরদলোকেরা ওঁকে তো কেউ চিনত না। উনি এবাদতখানায় ঢুকে কুলগাছ থেকে ফজুর বাঁধন খুলে দিলেন। ছেলেটা তখন আধমরা। মুয়ে খুন ঝরছে। কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'কত বড়ো বুজুর্গ হয়েছে, কত জিন পোষা আছে, দেখি। সাধ্য থাকে তার জিনেরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিক।' এই বলে এবাদতখানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

কচি ॥ অসাধারণ ! বড়ো আম্মা, তোমার প্রতি হাজার-হাজার সালাম ! তুমি নুসাইবার বাড়া !

দি বেগম ॥ পরে এই নিয়ে হাজার কথা রটেছিল। তবে গাঁয়ের লোকেরা মনে-মনে শাশুড়িসাহেবার ওপর খুশিই হয়েছিল। শ্বশুরসাহেব এরপর সাতদিন এবাদতখানার ভেতর 'এত্তেকাফ্' নিয়েছিলেন। সাতদিন পরে শুনলাম, উনি সফরে রওনা দিয়েছেন। আলিবখ্শ্ এবাদতখানার জিম্মাদার রইল। তাকে কালা জিনেরা এসে খুব জ্বালাত।

কচি ॥ কোথায় গেলেন উনি ?

দি বেগম ॥ মাসতিনেক পরে খবর হয়েছিল, নুরপুরে আছেন।

কচি ॥ ছোটোদাদাজি তখন ওই এরিয়ায় ছিলেন। দেখা হয় নি ?

দি বেগম ॥ শুনেছি তিনক্রোশের ফারাক। তাই দেখা হয় নি। আর দেওরসাহেব আব্বাকে দেখা দেবেনই বা কেন ? উনি তখন নাকি হিঁদু হয়েছেন। সত্যিমিথ্যে জানি নে, শুনেছি।…

হাম্মালাতুল হাতাব !

নুরপুর মৌলাহাট থেকে পনের ক্রোশ দূরে। কাজি গোলাম হোসেন ক-বছর আগে ফরাজি মজহাবভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই মৌলাহাট এসে নুরপুর সফরের অনুরোধ করতেন। 'মৌলবী' খেতাবধারী আধা-মুসলমান আফতাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই মনে নুরপুর যাওয়ার খাহেস ছিল। পাঁচক্রোশ দূরে সাহাগঞ্জ থেকে কাজিসাহেবের কাছে আগাম খবর পাঠিয়েছিলাম। পরদিন মগরেবের সময় দেখি, তেজি দুইটি ঘোড়ার টাঙ্গাগাড়ি হাজির। কাজি সাহেবও স্বয়ং হাজির। মাঘমাস। রাস্তায় ঘন ধুলো। সকালে রোদ একটু চাঙ্গা হলে রওনা দিয়েছিলাম। সাহাগঞ্জের সড়কের দুধারে কাতারে-কাতারে মানুষ। তারা বাচ্চাদের মতো কান্নাকাটি করে বিদায় জানাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে বহু হিন্দুও ছিলেন। কৃষ্ণপুরের জমিদারকন্যার জিন-ভাগানোর খবর জেলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। নুরপুর পৌঁছুতে বিকেল হল। দূর থেকে উঁচু স্তম্ভটি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, ওটি একটি রেশমকুঠি। কাজিসাহেবের কাছে শুনলাম, কমাস আগে ওই কুঠির আংরেজ মালিক খুন হয়েছে। বললাম, মাশাল্লাহ্ ! সাবাস ! এই কাজ যে করেছে, তার জন্য বেহেশত্ বরাদ্দ।

কাজিসাহেব বললেন, স্ট্যানলিসাহেব খুব জুলুমবাজ ছিল। এলাকার সকলেই ওর দুশমন। তাই পুলিশ খুনীদের পাত্তা পায় নি। তবে স্ট্যানলির গায়ে গুলির জখম থাকায় গবরমেণ্টের সন্দেহ, একাজ 'বন্দেমাতরমওয়ালাদের'। জিগ্যেস করলাম, তারা কারা? কাজিসাহেব যা বললেন, শুনে মনে হল, হিন্দুরা হিন্দুস্তানে বাদশাহি কায়েম করতে চায়। এটা ভালো লক্ষণ নয়। কথাপ্রসঙ্গে সেই মৌলবিটির খবর জিগ্যেস করলাম। কাজিসাহেব তাচ্ছিল্য করে বললেন, আফতাব আবার একটা মানুষ? শুনেছি সে এখন কলিকাতায় আছে। খবরের কাগজ ছাপবে। মুরপুরে টাঙ্গা পৌঁছুলে খুশি হয়ে দেখি, এখানেও কাতারে-কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করছে। কাজিসাহেব বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ! মুরপুরেও একটি ফরাজি জামাত কায়েম হবে। এই মুরপুরে থাকার সময় একজন আংরেজিজানা যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার নাম দিদারুল আলম। সে আমাকে ফরাজি মজহাবের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করত। একদিন সে আমার কাছে একখানি প্রকাণ্ড কেতাব হাতে হাজির হয়। বলে, হজরত! আপনি হাজি শরিয়তুল্লার কথা বলেছিলেন। এই বহিখানি পুরাতন একটি সম্বাদপত্রের সংকলন। আমার আব্বা সদর শহরে ওকালতি করতেন। সম্বাদপত্র এবং বহি সংগ্রহ তাঁর বাতিক ছিল। হঠাৎ এই বহিখানির একটি পৃষ্ঠা পড়ে আমার খুন টগবগ করছে। আপনি এই পৃষ্ঠাটি পড়ে বলুন, এ সম্বাদ সত্য না মিথ্যা। বিরাট কেতাবখানি খুলে দেখি বাঙলা হরফে ছাপা। পৃষ্ঠাটিতে চোখ রাখলাম। তারপর আমারও খুন টগবগ করে ফুটতে থাকল।

"শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশকমহাশয় বরাবরেষু।—সংপ্রতি জিলা নবীয়ার অন্তঃপাতি নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমির নামে এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমত গোবরডাঙ্গানিবাসি বাবু কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধনপ্রাণবিষয় এবং আর ২ হিন্দুবর্গিগের জাতি প্রাণ ধ্বংস করণে প্রবর্ত্ত হইলে তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয় দাঙ্গা বোধ করিয়া ফৌজদারী নাজির মোহম্মদ পুলিসকে কএকজন চাপড়াশ সমেত নারিকেলবাড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুষ্ট জবনেরা নির্দ্দয়তারূপে ঐ অভাগা পুলিস নাজিরকে বধ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রিপোর্টমতে কলিকাতা হইতে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া তিতুমির জবন এককালীন নিপাত হইল।…"

মুখ তুলে বললাম, দিদারুল! তিতুমিরের কথা আমি জানি। মরহুম আব্বাসাহেবের কাছে তাঁর পাহ্‌লোয়ানির বিবরণ শুনেছি। তিনি শহিদ এবং বেহেশতে তাঁর স্থান সুনিশ্চিত। দিদারুল বলল, হজরত! পরের কথাগুলান পড়ুন। ওই পৃষ্ঠায় আবার নজর দিলাম। চমকে উঠলাম। আমার চোখ নিষ্পলক হয়ে রইল।

…ইদানিং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিয়তুল্লা নামে এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বি লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটিদেশে চর্ম্মের বস্ত্র ভৈল করিয়া তৎচতুর্দ্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেবদেবীপূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মালকতগঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগরনিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্মরাশি করিলে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দাঙ্গায় অর্পিত হইয়াছে।…আর শ্রুত হওয়া গেল দলভুক্ত দুই জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তাবিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেবদেবীপূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদারবাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করিলেন ঐ সাহেব বিচারপূর্ব্বক কএক জবনকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন এবং এবিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন।…আমি বোধ করি সরিতুল্লা যবন যেপ্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর ২ প্রবল হইতেছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না।…ইতি ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র। জিলা ঢাকানিবাসি দুঃখি তাপিগণস্য।

আমি চোখ তুলে দেখি দিদারুল আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল, সমাচারদর্পণ পত্রিকার ইংরাজি ১৮৩৭ সালের ২২ এপ্রিল এই চিঠি ছাপা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আপনার কী মত? আত্মসংবরণ করে বললাম, মরহুম আব্বার কাছে শুনেছি, হাজি শরিয়তুল্লা একজন জবরদস্ত আলেম ছিলেন। হিজরি ১২১৮, কী ১২১৯ সনে দিল্লিতে ওহাবি আলেম আবদুল আজিজ ফতোয়া জারি করেন, নাসারাদের বিরুদ্ধে মুসলমানের জেহাদে নামতে হবে। সইদআহমদ বেরিলভি তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। হিজরি ১২৭৪ সনে হিন্দুস্তানের তামাম হিন্দু-মুসলমান সিপাহী আংরেজশাহির সঙ্গে জেহাদ লড়েছিল। সেই জেহাদে ওহাবিরাও যোগ দিয়েছিলেন। হাজি শরিয়তুল্লা সেই রাহের (রাস্তার) রাহি। হিন্দুস্তানের মুসলমানকে বুত্-পরস্তি (পৌত্তলিকতা), শের্ক্ (ঈশ্বরের অংশীদারি), বেদা'য়েত (উদ্ভাবনামিতা) থেকে বাঁচাতে এই আলেম জানকবুল করেছিলেন। এই খতের (চিঠির) বয়ান বিলকুল ঝুট! দিদারুল উত্তেজিতভাবে বলল, চিঠির বয়ানে স্পষ্ট, শরিয়তুল্লা শুধু হিন্দু বড়োলোক-জমিদারদের জুলুম থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সুবে বাঙলায় মুসলমানের অবস্থা চিন্তা করুন হজরত! তারা গরিব হয়ে পড়েছে দিনে-দিনে। হিন্দুরা ইংরেজি শিখে ইংরেজের ধূর্ত বুদ্ধি অর্জন করেছে। তারা মুসলমানদের পায়ের তলা থেকে মাটি কেড়ে নিচ্ছে। আরও দেখুন হজরত, পলাশীর যুদ্ধে শুধু মিরজাফর বেইমানি করে নি একা। জগৎশেঠ, আমিরচাঁদ, বল্লভ, রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ নন্দকুমাররাও বেইমানি করেছিল। ১৮৫৭ সনের সিপাহি বিদ্রোহে যখন সারা হিন্দুস্তানে হিন্দু-মুসলমান এককাট্টা হয়ে লড়েছে, তখন বাঙলার ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু ইংরেজের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমার কলেজজীবনের হিন্দু-বন্ধুদের কেউ-কেউ তামাসা করে বলে, তোমরা সাতশো বছর আমাদের জুলুম করেছ। আমরা তা ভুলতে পারব না। আমি ওদের বলি, ওটা ইংরেজের শেখানো কথা। রাজাবাদশাহরা প্রজার ওপর জুলুম করতেই পারে। এর কোনো হিন্দু-মুসলমান নেই। কিন্তু সত্যিই যদি তাই হত, যদি তোমাদের ধর্ম ধ্বংস করত মুসলমানরা, তোমাদের মন্দির চুরমার করত, তাহলে হিন্দুস্তানে এত প্রাচীন মন্দির থাকত না। এত হিন্দু থাকত না। ইংরেজের ইতিহাস পড়ে তোমরা বল, এই জেলায় মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দু মন্দির ভেঙেছিলেন। চলো, তোমাদের দেখিয়ে দিই, তাঁর আমলের কত মন্দির কাটরামসজিদে তাঁর কবরের আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা ঔরঙ্গজেবের নিন্দা কর। কিন্তু চিন্তা করে দেখ না, খেয়ালি বাদশাহ শাহজাহান রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছিলেন বিলাসিতায়। তাজমহল! ভাবুন হজরত, ওই একটা তাজমহল গড়তে কত কোটি-কোটি টাকার ধনরত্ন খরচ করা হয়েছিল! এমন উচ্ছৃঙ্খল কাণ্ডজ্ঞানহীন বাদশাকে বন্দী করা কি উচিত হয় নি? ঔরঙ্গজেব যদি হিন্দুদ্বেষী, কেন তাঁর প্রধান সেনাপতি হিন্দু যশোবন্ত সিং? কেন উদিপুরী নামে হিন্দু বেগমকে তিনি মুসলমান করেন নি? তখন ঔরঙ্গজেবের বদলে যদি হিন্দু বাদশাহ থাকতেন, তিনিও একই কাজ করতেন। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে জিজিয়া করের মতো কর আদায় করতেন!…এই মুসলমান যুবকটির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। সে জোরে শ্বাস ফেললে মনে হল গরম সাইমুম বয়ে বয়ে গেল আগুনের হলকা ছড়িয়ে। কাজিসাহেব

হাসতে-হাসতে বললেন, দিদারুল তার আব্বার ওকালতির ধারাটি পেয়েছে। বাপজান! এবার হুজুরকে একটু আরাম করতে দাও। দিদারুল জিভ কেটে শরমেন্দা ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। বলল, আর-একটা কথা আপনাকে জানাবার ছিল হজরত! হিন্দু রাজা জমিদাররা কংগ্রেস দল গঠন করেছে। কিছু মুসলমান ধান্দাবাজও ওই দলে ঢুকেছে। এদিকে বঙ্কিম চাটুজ্জের নবেল পড়ে কিছু হিন্দু বন্দেমাতরম করে বেড়াচ্ছে। তারা দেশকে দুর্গাদেবী বলে পুজো করছে। এ অবস্থায় আমার মনে হয় মুসলমানদেরও একটি দল গড়া উচিত। আমি শিগ্‌গির কলকাতা যাচ্ছি। সেখান থেকে আমরা কয়েকজন আলিগড়ে রওয়ানা হব। দোয়া করুন, যেন সফল হই। বলে সে আমার পদচুম্বন করল। আমি তার কপালে চুম্বন করে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। হা আল্লাহ! এই যুবকের মধ্যে আমি কি শফিউজ্জামানেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম? শফি তো এত কথা বলিয়ে ছিল না। অথচ ওর মুখ দেখে টের পেতাম, ওর মধ্যে কথার পাহাড় আছে, যে পাহাড়ের তলায় আল্লাহ আগুন মজুত রেখেছেন। শফি ছিল শান্ত, চুপচাপ, গম্ভীর। অথচ কী আশ্চর্য, দিদারুল যেন শফিরই একটি রূপ বলে ভ্রম হয়। এদিন যতবার দিদারুলের কথা মনে পড়ল, ততবার শফি সামনে দাঁড়াল। বিকেলে আসরের নামাজের পর অভ্যাসমতো একা বেড়াতে বের হলাম। কাজি সাহেবকে নিষেধ করলাম, কেউ যেন আমার অনুসরণ না করে। তাহলে তার বিপদ হবে। আমার জীবনে আসলে সূর্যাস্তের সময়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে বরাবর। বস্তুত এই একটা সময়, যখন আসন্ন রাত্রির জন্য দুনিয়া জুড়ে বিচিত্র প্রস্তুতি ও হুঁশিয়ারি লক্ষ করা যায়। চরাচর-স্থাবর-জঙ্গমে কী এক চাপা ব্যস্ততা শুরু হয়। 'হুঁশিয়ার-নাম,' কেতাবটি যিনি লিখেছেন, তিনি ইল্‌ম্ (প্রজ্ঞা) লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই। আমি আরবি ভাষায় আফলাতুন (প্লেটো) এবং তাঁর তালেবুলইল্‌ম্ (ছাত্র) আরিস্তোনের (অ্যারিস্টোট্‌ল্) কেতাব পড়েছি। মাদ্রাসাগুলিতে ওঁদের কেতাব এখনও পাঠ্য। কিন্তু আমার বিবেচনায় হুশিয়ার-নামার লেখক অধিক বিজ্ঞ। নুরপুর গ্রামটি উচ্চভূমিতে অবস্থিত। দক্ষিণে ধাপবন্দী মাঠ। কোথাও শস্যশূন্য খেত, কোথাও জঙ্গল। জঙ্গলের কিনারায় একটি নীচু ঝোপে পাখির বাসা দেখলাম। পাখিটি সম্ভবত ডিমে তা দিচ্ছিল। আমাকে দেখেও উড়ে গেল না। আল্লাহের কুদরত বোঝা কঠিন। পাখিদের তিনি কেন সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয় তাঁর বন্দেগির জন্য। দিনশেষের মিঠে আলোয় পাখিদের বন্দেগি শুনতে পেলাম। একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আচানক সামনেকার জঙ্গল থেকে একটি আউরত মাথায় লকড়ির পাঁজা নিয়ে বেরুল এবং আমার চোখে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সবিস্ময়ে দেখলাম, এ তো সেই আবদুল কুঠোর বিবি—'হাম্মালাতুল হাতাব'। আমি হো হো করে হেসে ফেললাম। অমনি ইকরাতন লকড়ি নামিয়ে রেখে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল। বিব্রত হয়ে বললাম, ছাড়্, ছাড়্! এ কী করছিস তুই—নাদান বেশরম লড়কি! ইকরাতন কান্নাজড়ানো গলায় বলল, হুজুর! আমাকে মাফ করুন। আমি আপনার কথা মানি নি। আপনি আমার জান বাঁচিয়েছিলেন! বললাম, তুই তো ছোটোগাজির বাড়ি ভালোই থাকতিস! আলি বখ্‌শ্‌কে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গিয়েছিলি কেন? ইকরাতন উঠে দাঁড়িয়ে চোখ মুছে মুখ নামিয়ে বলল, বড়োগাজির ভয়ে। সে লোক ভালো নয়। আর হুজুর, আলি বখ্‌শ্‌ আমার হাত ধরেছিল। খাপ্পা হয়ে বললাম, ঝুট বলিস না! আলি বখ্‌শ্‌ পরহেজগার (ধার্মিক) লোক। ইকরাতন আবার কেঁদে উঠল, আল্লার কসম, হুজুর! বললাম, তুই এখানে কোথায় আছিস? নিকাহ্ করেছিস কি? সে মাথা নেড়ে আস্তে বলল, আমার সোয়ামির বহিনের বাড়িতে আছি। তারও সোয়ামি নেই।

ধান ভেনে খায়। আমিও ধান ভানি তার সঙ্গে। খুব ভালো মেয়ে। মায়ের পেটের বহিনের মতন জানে আমাকে। হাসতে-হাসতে বললাম, ডাহিনগিরি ছেড়েছিস, নাকি এখনও চালিয়ে যাচ্ছিস? সে এবার মুখ নামিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, জি না। আর বড়ির কাজ করি না। খুশি হয়ে বললাম, ভালো করেছিস। তো এই যে বেপরদা হয়ে একা জঙ্গলে আসিস, তোর ডর হয় না? বলল, ডর হয়। তবে কী করব? বললাম, তুই নিকাহ্ করছিস না কেন? বলল, সে-ইচ্ছা আমার নেই হুজুর। পুরুষলোকেরা নেমকহারাম। আমার ঘেন্না হয়। সে লকড়ির পাঁজা তুলে করুণ স্বরে ফের বলল, দোহাই হুজুর, এখানে কাউকে যেন বলবেন না আমি ডাহিন (ডাইনি) ছিলাম। সে পা বাড়ালে ডাকলাম, ইকরাতন! একটা কথার জবাব দিয়ে যা। সে ঘুরে দাঁড়ালে বললাম, তুই কি সত্যই হিন্দু ছিলিস? বলল, জি হ্যাঁ। বললাম, বাস্তুন ছিলিস কি? ইকরাতন গলার ভেতর বলল, যা চাপা আছে, তা চাপা থাক হুজুর। আপনি পির। আপনার নাজানা কিছু নেই। সে দ্রুত চলে গেল। আমি তাকিয়ে থাকলাম, যতদূর গেল। চেহারার বদল হয়েছে মেয়েটার। খাওয়া-দাওয়া ভালোই জুটছে বোধ করি। দিনশেষে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। সামনে একটা পুকুর দেখলাম। ভাবলাম, ওই পানিতে অজু করে নমাজ পড়ব। কিন্তু সঙ্গে বদনা আনি নি। আর পানির ধারে পাঁক। তাই জঙ্গল থেকে দূরে একটি বাঁজা ডাঙায় গেলাম। ডাঙাটিতে অসংখ্য তালগাছ। সূর্য ডুবলে একথানে পরিষ্কার নাঙ্গা মাটিতে হাত দুখানি ঘষে 'তৈয়ম্মুম' (জলের অভাবে এভাবে অজুর বিধি আছে) করলাম। হা আল্লাহ! নামাজের সময় সামনেকার তালগাটি বারম্বার একটি নাঙ্গা আউরতের মতো বোধ হচ্ছিল। 'হাম্মালাতুল হাতাব'—ওই কাঠকুড়োনি মেয়েটি কি কালা জিনের কোনো জাদু? ও কে? কে ও?…

Her fect are tender, for she sets her steps,
Not on the ground but on the heads of men...
—Homer

হিজরি ১৩১৬ সনের কথা। জ্যৈষ্ঠ মাস। ওই মাসে মহরমের দিন অ ছপুরের হানাফিরা তাজিয়া নিয়ে মৌলাহাটের মাঠঅব্দি এসেছিল। খোদার কুদরত! আচানক খুব ঝড়পানি এসে গেল। মৌলাহাটের ফরাজিরা লাঠিবল্লম তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। শশুরসাহেব নুরপুরে আছেন। অছিপুর-ওয়ালারা ভেবেছিল, মৌলাহাটওয়ালারা আগের জমানার মতন তাদের তাজিয়া আর জঙ্গ দেখবে। মুখোমুখি দুইদল দাঁড়িয়ে গেছে। হরিণমারা থানায় ঘোড়া ছুটিয়ে খবর দিতে গেছেন ভাসুরসাহেব। হেন সময়ে মেঘ ডাকল। আসমান কালো হয়ে গেল। জড়বড় করে শিলপড়তে থাকল। আমার শিলকুড়ুনো অভ্যাস ছিল। শাশুড়িসাহেবা বকাবকি করছিলেন। তারপর ঝড়পানি এল। ছুপু ভিজতে-ভিজতে বেরিয়ে গেল ফজুকে খুঁজতে। ভয় করছিল, বাজ পড়ে ও মারা না যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে হাসতে-হাসতে বলল, মাঠে যাব কী, অছিপুরের তাজিয়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে হোরাম-জাদারা ভেগে গেছে। শাশুড়িসাহেবা উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, ফজুর কী হল কে জানে? ছুপু বলল, ফজু খুব চালাক ছেলে, বিবিসাহেবা! ভাববেন না। ঠিক তাই। সন্ধ্যার মুখে ঝড়পানি থামলে ফজু দিব্যি ফিরে এল। কোনো গাছতলায় গোরুছাগল নিয়ে বসে ছিল। কিন্তু তখনও জানতাম না কী খবর আসছে। লম্ফ জ্বেলে রফিকে দুধ খাইয়ে ওর আব্বার কোলে দিয়ে দলিজঘরে গেছি, মেঘ ভেঙে মহরমের চাঁদ বেরিয়ে পড়েছে। দরজা খুলে দুনিয়ার অবস্থা দেখছি। সেই সময় প্যাচপেচে কাদায় এক ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখে চমকে উঠলাম। ঘোড়াটা দলিজের বারান্দার কাছে দাঁড়ালে যিনি নামলেন, তিনি বারি-চাচাজি! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, চাচাজি! চাচাজি!

বারিচাচাজি আস্তে বললেন, রুকু? তোরা কেমন আছিস, মা? আমি বুক ফেটে কেঁদে ফেললাম। বারিচাচাজি আমাকে টেনে দলিজঘরে ঢুকলেন। শাশুড়িসাহেবা ডাকছিলেন, বউবিবি! কী হল? ও বউবিবি? বারান্দায় গিয়ে বললাম, বারিচাচাজি এসেছেন, আম্মা! শাশুড়িসাহেবা ব্যস্তভাবে লণ্ঠন নিয়ে এলেন। লণ্ঠনটা দলিজঘরে রেখে বললাম, এতদিন কোথায় ছিলেন চাচাজি? শাশুড়িসাহেবা দরজার ওপাশ থেকে মৃদুস্বরে বললেন, ভাইঝিরা কেমন আছে, কী হালে আছে ভাইসাহেবের জানার গরজ কিসের! বারিচাচাজি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, কোন্ মুখে আপনাদের সামনে দাঁড়াব, আপা? শফিকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাকে হারিয়ে ফেললাম! দেখলাম, শাশুড়িসাহেবরা দরজা থেকে সরে গেলেন। বললাম, চাচাজি! আপনার এ কী চেহারা হয়েছে? বারিচাচাজি বললেন, তোর অবস্থাও ভালো দেখছি না। যাই হোক, শোন্ আমি দেওয়ানি চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বহরমপুরে আছি। সেদিন তোর ভাসুরসাহেবের সঙ্গে দেখা হল। মামলা-মোকর্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন বললেন। কথায়-কথায় জিগ্যেস করলাম, ওঁর শাশুড়ির সম্পত্তির ফারাজ (শরিয়তি বণ্টন) হয়েছে কিনা। বললেন, হবে'খন। রুকুকে তো ধান-খদ্দের ভাগ পাঠিয়ে দিই। একথা শুনে আস্তে বললাম, পাঁচ বস্তা ধান, আধবস্তা ছোলা দিয়েছে এ বছর। রোজির আমার সঙ্গে দেখা নেই অনেকদিন থেকে। বারিচাচাজি বললেন, সেকথা ভেবেই এলাম। কালই মজলিশ ডেকে তোর মায়ের সম্পত্তির 'ফারাজ' বের করব। বললাম, ওকথা থাক। হাত-মুখ ধোন। পানি এনে দিই। বারিচাচাজি বললেন, দাঁড়া। বড়ো খবর আছে একটা। তোর শাশুড়িকে ডাক্। উনি শফির জন্য আমাকে মাফ করতে পারেন নি। তবে শফিকে আমি চুঁড়ে বের করবই। ডাক্ ওঁকে। খুব জরুরি খবর আছে। শাশুড়িসাহেবা বারান্দার একটু তফাতে গুঁটি আঁকড়ে বোধ করি কাঁদছিলেন। ডাকলে চোখ মুছে কয়েক পা এগিয়ে এলেন। বারিচাচাজি বললেন, পিরসাহেবের খবর রাখেন, আপা? শাশুড়িসাহেবা বললেন, না। তাঁর খবরে আমার কাম কী? বারিচাচাজি একটু ইতস্তত করছিলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কোনো খারাপ খবর নয় তো চাচাজি? বারিচাচাজি হঠাৎ কেমন হাসলেন। বললেন, নুরপুরের কাজি গোলাম হোসেন কাল বহরমপুরে গিয়েছিলেন। আমার চেনা লোক। উনি একটা আশ্চর্য খবর দিলেন। পিরসাহেব একটি মেয়েকে নিকাহ্ করেছেন। বললাম, সে কী! বারিচাচাজি বললেন, পয়গম্বরের তরিকা (পন্থা) মেনে চলতেই পারেন। তাছাড়া মুসলমান চারবিবি রাখতে পারে। এটা কোনো কথা নয়। আমার অবাক লাগল, মেয়েটি এই মৌলাহাটেই নাকি কোনো চাষাভুষো একজনের বউ ছিল। কী যেন নামটা—শাশুড়িসাহেবা শক্ত গলায় বললেন, ইকরাতন! বারিচাচাজি বললেন, হ্যাঁ—ইকরাতন। আমার কী হল, ছুটে গিয়ে শাশুড়িসাহেবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলাম। শাশুড়িসাহেবা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বললেন, খামোশ! বেয়াদপ লড়কি! তারপর বারিচাচাজির উদ্দেশে শান্ত স্বরে বললেন, এ কোনো নতুন খবর নয়, চৌধুরীসাহেব! এ আমি জানতাম। বারিচাচাজি বললেন, আপনি জানতেন? শাশুড়িসাহেবা আস্তে বললেন, বউবিবি, চাচাজিকে হা-মু ধুতে পানি দাও। আমি খানার ইন্তেজাম করি। রফির আব্বা রফিকে শুইয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। দেয়াল ধরে এগিয়ে দলিজে গেলেন। গোঙানো স্বরে আসসালামু আলাইকুম বললেন। আমি ওঁকে বললাম, আপনার আব্বার কাণ্ড শুনেছেন? সেই আবদুল কুঠোর বিবিকে নিকাহ্ করেছেন! রফির আব্বা বিকটগলায় হাসতে থাকলেন। রাগেদুঃখে বেরিয়ে এলাম। বালতি ভরে পানি আর বদনা নিয়ে যাবার সময় রান্নাঘরের উনুনের সামনে শাশুড়িসাহেবাকে দেখলাম। হতভাগিনী চুপিচুপি কাঁদছেন।… (ক্রমশ)

বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাস-নির্দিষ্ট অবস্থিতি

অজয় রায়

বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্নটি নিয়ে কিছু বলা দরকার, তা হল—১৯৭৭-উত্তর পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন যে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত, বিষয়গত এবং বিষয়িগত দৃষ্টিকোণ থেকে যা সম্ভব ছিল, তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছে কি-না। এই প্রশ্নটা গোড়াতেই আলোচনা করতে চাই এই কারণে যে, এদেশেরই অনেক লেখক বলতে চান যে বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য এদেশে যে ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল, তা তাঁরা করতে পারেন নি। আর এ প্রসঙ্গ থেকেই তাঁরা প্রশ্ন তোলেন বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

বস্তুত, কোনো দেশে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনই কটিকয়েক ব্যক্তির উদ্যোগ বা প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না। প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি অনেকখানি নির্ভর করে সেই আন্দোলন সংশ্লিষ্ট সমাজের সমকালীন চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে পারছে কি না তার উপর। আবার একই সময়ে আন্দোলনের অন্যান্য ধারাও থাকতে পারে, তবে তা যদি সমাজের সমকালীন প্রয়োজনীয়তাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত না করে, তাহলে তা ক্ষীণকায়ই থেকে যায়। তা ছাড়া, রাজনৈতিক দল বা রাজনীতির বিভিন্ন ধারা যে বিভিন্ন শ্রেণী বা শ্রেণী-অংশের স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে বিকশিত হয়, তার পুনরুল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। তথাপি উল্লেখ করতে হল এই কারণেই যে অনেকে যখন বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের অতীত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখেন তখন তাঁরা এই দুটি কথা হয় ভুলে যান, নয়তো মনে রাখা প্রয়োজন মনে করেন না। সে কারণে তাঁদের আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণত হয় বাস্তবতাবর্জিত আপ্তবাক্যে।

এক

সর্বভারতীয় অর্থনীতি থেকে বিযুক্ত হয়ে, দেড় হাজার

লেখক বর্তমানে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক। জন্ম ১৯২৮ সালে, ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে। বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সংগঠনের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে শামিল হন ছাত্রাবস্থা থেকেই। পাকিস্তানি আমলে বিভিন্ন মেয়াদে দশ বছর কারাবন্দী থাকেন, আত্মগোপন করে থাকেন তিনচার বছর। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব পালন করেন। একাধিক রাজনীতিক-আর্থনীতিক গ্রন্থের লেখক, তিনটি উপন্যাসও লিখেছেন।

মাইল দূরের এক ভূখণ্ডের সঙ্গে এক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সংযুক্ত হবার ফলে, এবং শাসনক্ষমতা পাকিস্তানের বড়ো ধনিক আর ভূস্বামীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হবার ফলে, শুধু যে পূর্ববাংলার অর্থনীতি কালক্রমে এক ধরনের ঔপনিবেশিক শোষণের শিকলে জড়িয়ে পড়ল তা-ই নয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণে দেশবাসীর চিন্তা-চেতনার জগতেও সচেতনভাবে ব্যাপক এক পরিবর্তনসৃষ্টির চেষ্টা করা হল। শেষোক্ত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করা দরকার এই কারণেই যে, বিষয়গত উপাদানের বিকাশ এই ঘটনাটির দ্বারাই বহুল পরিমাণে প্রভাবিত।

শেষোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার, পাকিস্তানের দাবি সে সময় প্রকৃত অর্থেই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ ঘটনার পিছনে আর যে কারণই থাক না কেন, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের মধ্যেই মুক্তির পথ খুঁজেছিল বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। আর তারই সুযোগে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সচেতনভাবে প্রয়াস পেয়েছিল এমন কিছু ধ্যানধারণার বিস্তৃতি-সাধনে যা তাদের শাসনকে দিতে পারে স্থায়িত্ব। এই প্রয়াসের মধ্যে একটি হল—বাঙলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অতীত ঐতিহ্য, বাঙালি এবং উপমহাদেশীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার অতীত ইতিহাস—যা কিনা জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে তাদের সমন্বিত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সম্পর্ক—তার সমস্ত-কিছুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানো। পরিবর্তে মুসলিম লীগের ধারাকেই উপস্থিত করা হল ঐতিহ্য হিসেবে। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন বিকৃত রূপে চিত্রিত করা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসরূপে। ভারতীয় জনগণের অতীত কীর্তির পরিবর্তে মধ্যপ্রাচ্যের অতীত মুসলিম সাম্রাজ্যসমূহের কীর্তিসমূহকে উপস্থাপিত করা হল ঐতিহ্যরূপে। আর সেসব করতে গিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত কীর্তি-সমূহকেও অস্বীকার করা হল সচেতনভাবে। আর সেইজন্যই উনিশ শো সাতচল্লিশের পর মওলানা আবুল কালাম আজাদ বা মওলানা মহম্মদ আলী প্রমুখ ব্যক্তিরা যেমন বাংলাদেশে স্বীকৃতি পান নি, তেমনি পান নি হুমায়ুন কবিরদের মতো ব্যক্তিত্ব, উপেক্ষিত হয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচালনায় ত্রিশের দশকের 'বুদ্ধি-মুক্তি আন্দোলন।' পরিবর্তে স্কুলপাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হল নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্ বা অনুরূপদের জীবনী। ব্রিটিশ সরকারের দালালি করে চামড়ার ব্যবসায়ী যে নওয়াবে পরিণত হয়েছেন, সে ইতিহাস গোপন রাখা হল সচেতনভাবে।

ইতিহাসবিকৃতির এই সচেতন প্রচেষ্টার কিছু ফল যে না ফলেছে তা নয়। অন্তত এইটুকু হয়েছে যে, সাতচল্লিশ-পরবর্তীতে যাঁরা বড়ো হয়ে উঠেছেন তাঁদের অধিকাংশই অজ্ঞ থেকে গেছেন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অতীত সম্পর্কে।

মুসলিম লীগের ব্যাপক প্রভাবের কুফল আরো ফলেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ধারার থেকে বিচ্ছিন্নতা। (মনে রাখা দরকার—মুসলিম লীগের আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্য-বাদের স্বার্থানুকূল। তার সঙ্গে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বের দোদুল্যমানতাজনিত সীমাবদ্ধতা কোনো কারণেই তুল্য নয়, সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সম্পর্কে চেতনার ষোলো আনাই রয়ে গিয়েছিল অত্যন্ত দুর্বল। আর তার প্রতিক্রিয়া পরবর্তী কালে যে গভীর হতে বাধ্য, তা বলাই বাহুল্য।

দুই

বাঙলা ভাষার বিকাশ, তার দীর্ঘ ইতিহাস, এবং বাঙলার গ্রামে-গ্রামে পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের বাস, উভয় সম্প্রদায়ে সমভাবে আদৃত সমৃদ্ধ মানবিক তথা উদার লোকসাহিত্য প্রভৃতির অবস্থিতির কারণে বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ কোনো সময়ই মৌলবাদী ধর্মীয় আচার-রীতি-নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। উনিশ শতকে মুসলমান সমাজে রক্ষণশীল ধর্মীয় সংস্কারের যে চেষ্টা করা হয়, তার পরও এটাই সত্য। নিখাদ ইসলামের শ্লোগান ব্যাপক জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে নি। কথাটা বুঝতে হবে বাংলাদেশের মানুষের ধর্মপ্রাণতার মধ্যে মৌলবাদের অবস্থানকে লক্ষ করে।

আর এ সবকিছুর জন্যেই জাতীয় চেতনাও কম-বেশি প্রভাব ফেলেছিল মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা চাকরি প্রভৃতিতে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার জন্য দ্বিজাতিতত্ত্বকে জোরে আঁকড়ে ধরেছিল, তাদের একাংশের মধ্যেও ক্রমান্বয়ে প্রভাব ফেলছিল জাতীয় চেতনা। তার প্রমাণ যেমন নজরুল বা কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ, তেমনি তার প্রমাণ পরবর্তী ইতিহাস। বাঙলা আর আসামকে নিয়ে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণা, পরবর্তী সময়ে শরৎচন্দ্র বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দী পরিকল্পনা অনুসারে স্বাধীন বাঙলার চিন্তা—এইসব ঘটনা এই সত্যেরই এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ।

তবে একথাও সত্য যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের চেতনাই সেদিন ছিল প্রধান। তা জাতীয় চেতনাকে ছাপিয়ে উঠেছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে তখন যারা ছিল অপেক্ষাকৃত অগ্রসর, তাদের মধ্যেও এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাই প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই অবস্থাতেই উনিশ শো সাতচল্লিশে পাকিস্তানের কাঠামোতে নতুন করে যাত্রা শুরু হল। শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে ঐতিহ্য-বিকৃতির যে সচেতন প্রচেষ্টা চালানো হয়, সে ব্যাপারে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই ভাষার প্রশ্নে যে আন্দোলনের সূচনা হয় তাই-ই প্রমাণ করে যে, দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক সম্প্রদায়গত চেতনার খোলস ভেঙে জাতীয় চেতনা ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। বস্তুত, এই চেতনাই ক্রমে ভাষা এবং স্বাধিকার আন্দোলনের পথ বেয়ে স্বাধীনতার দাবিতে উপনীত হয়। এ সবই জানা ঘটনা। তথাপি এ ব্যাপারটিকে আরো একটু গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষিত বাঙালি মধ্য-বিত্তের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। জাতীয় চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে স্বাধিকারের দাবিতে এঁরাই ছিলেন অগ্রণী। বাংলাদেশের বিরোধী রাজনীতিরও (কমিউ-নিস্ট পার্টি) সূচনা করেছিলেন এঁরাই। শাসক-গোষ্ঠীর বিমাতা-সুলভ মনোভাব সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের ফলে মূলত ষাটের দশক থেকে এদেশে বাঙালি বুরজোয়াদের বিকাশও সূচিত হয়। বাঙালি জাতির অগ্রগতি এবং বিকাশ সম্পর্কে পাকিস্তানি শাসকদের যে ধারণা এবং যে জাতীয় নীতি ছিল, তার বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং উঠতি বাঙালি বুরজোয়াদের মধ্যে বিক্ষোভ ছিল প্রচণ্ড। এই বিক্ষোভ অবশ্যই জাতীয় চেতনা বিকাশের অন্যতম প্রমাণ। ব্যাপক মেহনতি জনগণের জীবনের ক্রম-বর্ধমান সংকটসমস্যাসঞ্জাত ন্যায্যসংগত ক্ষোভকে অঙ্গীভূত করে এঁরাই প্রতিবাদ, জাতীয় বিকাশ এবং উন্নয়নের দাবিকে বেগবান করে তুলেছিলেন। সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই এঁদের চেতনা, শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা প্রভাবিত করেছিল বিকাশমান জাতীয় আন্দোলনকে।

বিকাশমান জাতীয় আন্দোলনের পুরোধাদের অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের চেতনার সীমাবদ্ধ-তার দিকগুলি নির্দেশ করতে গেলে মনে রাখতে হবে, এঁরা শুধু যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বলয়ের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন তা-ই নয়, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কারণে বাহ্যত কিছুটা উপকৃতও হয়েছিলেন তাঁরা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আগের তুলনায় চোখে পড়ার মতো বিকাশের কথা বলছি।

পাকিস্তানি শাসকবর্গের জাতীয়দলননীতির কারণে তাঁদের সমগ্র প্রত্যাশা-পূরণের সম্ভাবনা ছিল রুদ্ধ। সেজন্য তাঁদের ক্ষোভ ছিল; আবার সারা ভারত থেকে আলাদা হবার কারণে তাঁদের বিকাশের ত্বরান্বিত গতিবেগ (আগের তুলনায়) তাঁদের মনে ভারত বা তৎকালীন প্রতিবেশী অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্পর্কে সন্দেহের জের টিকিয়ে রাখছিল।

একটি জাতির বিকাশ একদিনে হয় না। ইতিহাসের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমে জাতিসত্তার অবয়ব আকার নিতে থাকে। ব্রিটিশ আমলে বাঙালি জাতির অবয়ব এভাবেই হাজার বছরের ইতিহাসকে ধারণ করে ক্রমে বেশি করে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। সাতচল্লিশ-উত্তর কালে বাংলাদেশের চৌহদ্দিতে এই ভূখণ্ডের বাঙালিদের নবতর যাত্রার ক্ষেত্রে এই পর্বের পুরোধাদের যে বৈশিষ্ট্যটির কথা উল্লেখ করা হল, সেইসব কারণে জাতীয় বিকাশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রশ্নটি তুলে শাসকবর্গ সুযোগ পাচ্ছিল বিভ্রান্তিসৃষ্টির। বস্তুত, ধর্মীয় এবং জাতীয় বিকাশের প্রশ্নটি পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপন করার ব্যাপারটি বাংলাদেশের বাঙালিদের বিকাশের ক্ষেত্রে এখনো সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। এখন এই ব্যাপারটি যে সময়-সময় কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যটির প্রেক্ষিতে বিচার করা দরকার।

তা ছাড়া, মুসলিম লীগের প্রভাব একসময় সর্বব্যাপক থাকার কারণে এবং পরবর্তী সময়ে যে জাতীয় আন্দোলন বিকাশলাভ করল, তা মুখ্যত জাতীয়-দলননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাঝে সীমিত থাকার জন্যে, সমগ্র জাতীয় আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার দুর্বলতাও লক্ষণীয়।

বস্তুত, উল্লিখিত দুটি বিষয়ই বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনে নানা পর্বেই সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং করছে।

তিন

একটি দেশের বামপন্থীদের কর্তব্য কী তা নির্ভর করে সেই দেশের বাস্তবতার উপরে। বাংলাদেশের বাস্তবতার কতকগুলি দিক সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হল। এখানে আরো কতকগুলি দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

উনিশ শো সাতচল্লিশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ে বাংলাদেশ শুধু যে কৃষিপ্রধান ছিল তা-ই নয়, কৃষি-উৎপাদনে প্রাক্-মূলধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্কই ছিল সর্বব্যাপক। পরবর্তী কালে, মুখ্যত ষাটের দশক থেকে, উন্নত মানের বীজ, সেচ, রাসায়নিক সার প্রভৃতির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত মূলধন-নিবিড় আবাদ প্রচলনের চেষ্টা শুরু করার মধ্য দিয়ে প্রাক্-মূলধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্কের প্রেক্ষাপটে মূলধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্ক প্রসারের চেষ্টা শুরু হয় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। এই চেষ্টা এখনও অব্যাহত। আর এই চেষ্টার কারণে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অস্বাভাবিকভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে নিঃস্বকরণ-প্রক্রিয়া। ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মূলধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্ক বিস্তার লাভ করছে দ্রুততালে। আগের তুলনায় তা অধিক বিকাশমান হলেও, এখনো পর্যন্ত সরল পণ্য-উৎপাদন এবং প্রাক্-মূলধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্কই ব্যাপক। তবে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত, এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামীণ মূলধনীরাই মুখ্য শোষকে পরিণত হয়েছে। এরা সবাই যে একমাত্র কৃষির সঙ্গে যুক্ত তা নয়। ব্যাংক ঋণের সিংহভাগ করতলগত করা এবং কৃষি-উপকরণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার ভিতর দিয়ে এরা কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্যভাবেও সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। বস্তুত,

এরাই গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে প্রধান শোষক এবং প্রকৃত উৎপাদন বিকাশের পথে প্রাক্-মূলধনতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্কের পাশাপাশি এরাই প্রধান প্রতিবন্ধক।

সামগ্রিকভাবেও দেশে উনিশ শো সাতচল্লিশের তুলনায় মূলধনতন্ত্রের অনেক প্রসার ঘটেছে। ষাটের দশকে বাঙালি মূলধনীদের যেটুকু বিকাশ সাধিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ব্যাপক জাতীয়করণের কারণে তা স্বাভাবিকভাবেই সংকুচিত হয়ে আসে। তবে এ সময় প্রধানত আরেকটি ঘটনা ঘটে। রাষ্ট্রীয় খাতে উৎপাদিত পণ্য আভ্যন্তরীণ বাজারে বণ্টন এবং আমদানির ক্ষেত্রে ইনডেনটিংয়ের সাহায্যে একদল ব্যক্তি অতি দ্রুত ধনাঢ্য হয়ে যায়। এটা সম্ভব হয় তৎকালীন সরকারি দল এবং প্রশাসনের আনুকূল্যে। দু-এক বছরের মধ্যেই এরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এবং সরকারের জাতীয়করণের নীতি পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে শুরু করে। উনিশ শো পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্যত পূর্বোক্ত শ্রেণীরই আধিপত্য বিরাজ করছে। তাদেরই স্বার্থে ব্যাপক বিরাষ্ট্রীয়করণ সাধিত হয়েছে, এবং এভাবে বাংলাদেশে বর্তমানে সামগ্রিকভাবেই আগের তুলনায় শক্তিশালী হয়েছে মূলধনী শ্রেণী। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, নানা ধরনের ঢালাও সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও এই মূলধনীরা শিল্পের পরিবর্তে আমদানি-রপ্তানি, ব্যাবসার ঠিকাদারি প্রভৃতির মধ্যে থাকা এবং প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে এসবের মধ্য দিয়ে ধনী হয়ে ওঠাটাই পছন্দ করেন। বাংলাদেশের অবস্থায় শিল্পোদ্যোগী ধনিকে রূপান্তরের সম্ভাবনা এঁদের ক্ষেত্রে এখনো খুব কম। এঁরা শক্তিশালী হলেও দেশে উৎপাদনশক্তির বিকাশ হচ্ছে না। দেশ পশ্চাৎপদই থেকে যাচ্ছে। তার মাঝে এঁদের ধনস্ফীতির বিপরীতে দেশবাসীর দারিদ্র্য বুভুক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত লয়ে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে মূলধনী-সাম্রাজ্যবাদী বাজারের উপর এদেশের একান্ত নির্ভরতা এবং জাতীয় অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী-মূলধনী ঋণ এবং সাহায্যের ক্রমবর্ধমান পটভূমিকার মাধ্যমে এ দেশে নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। আর এভাবে স্থায়ী হচ্ছে এদেশে পশ্চাৎপদতা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। নানা কারণেই মূলধনতান্ত্রিক ধারায় এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। বণ্টনের ক্ষেত্রে অসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, শুধুমাত্র উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি বিচার করা যায়, তবু বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। দক্ষিণ কোরিয়া তাইওয়ান প্রভৃতি মডেলের কথা বলা হলেও, এবং সেই মডেল সামনে রেখে বিদেশী, মুখ্যত সাম্রাজ্যবাদী, মূলধন আকর্ষণের চেষ্টা হলেও এদিকে এগুলো সম্ভব হয় নি। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, সংকুচিত বাজার, বিদেশী মূলধনের আকর্ষণীয় কাঁচামালের বাজার—নানা কারণেই এটা সম্ভব হচ্ছে না।

আর এ সবকিছুর জন্য জাতীয় বিকাশ যেমন ব্যাহত হচ্ছে—তেমনি ব্যাহত হচ্ছে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ।

চার

এই পটভূমিতে বাংলাদেশের বামপন্থীদের ভূমিকা বর্তমান পর্যায়ে কী হবে, তা বিচার করে দেখা দরকার।

বামপন্থীদের ভূমিকা বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতা-নিরপেক্ষ কিছু হতে পারে না। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্তি এবং শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত তথা সব মেহনতি মানুষের স্বার্থে অর্থনৈতিক-সামাজিক

পুনর্গঠন, এক কথায় সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতা ও সমাজতন্ত্র—বামপন্থীরা সাধারণভাবে এই লক্ষ্য সামনে নিয়েই কাজ করে থাকেন। এই লক্ষ্য যেমন মেহনতি মানুষের ভাগ্যপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত, তেমনি তা সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের একমাত্র পথ। মূলধনতান্ত্রিক ধারা অনুসরণ করে সামগ্রিক অর্থে জাতীয় উন্নতি কোনো সময়েই হতে পারে না। মূলধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আশির দশকে যে গভীর সংকটে নিপতিত তা থেকেই একথার সত্যতা প্রমাণিত। বাস্তব ঘটনাও তাই। যেসব দেশ মূলধনতান্ত্রিক ধারা অনুসরণ করছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর তাদের ইতিহাস দেখলেই আমরা তা বুঝতে পারি। তবে এই ব্যাপারে আরও কিছু বলার আগে আরেকটি বিষয়ে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

বামপন্থী তথা প্রগতিশীলদের কাছে সামগ্রিক জাতীয় বিকাশের প্রশ্নটি মোটেই অবহেলার বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরঞ্চ তার বিপরীত। এবং বামপন্থীরা সামগ্রিক জাতীয় বিকাশের জন্যই উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর মূলধনতন্ত্রের পথ পরিহার করে; সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় মূলধনতান্ত্রিক ধারার বিকাশের যে কোনো সম্ভাবনা নেই, সে কথা ইতিপূর্বেই কিছুটা আলোচিত হয়েছে। উনিশ শ পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে মূলধনতান্ত্রিক ধারার বিকাশের জন্য একটানা চেষ্টা চলছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। তার ফলে দেশে গত দশ বছরে মূলধনতান্ত্রিক ধারা এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে মূলধনতন্ত্র যেমন একদিকে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল, তেমনি দেশে গত দশ বছরে শক্তিশালী হয়েছে আমলা-মুৎসুদ্দি ধাঁচের মূলধনী গোষ্ঠী। সারা দেশ এবং সরকারের উপরে এদেরই আধিপত্য। জাতীয় শিল্পের বিকাশের অপেক্ষাকৃত কঠিন পথ অনুসরণের পরিবর্তে এভাবেই অধিক মুনাফা অর্জনে তারা আগ্রহী, এবং সে পথই তারা অনুসরণ করছে। ফলে জাতীয় শিল্পের বিকাশ যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি সমগ্র দেশে গভীরতর হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকট। বর্তমানে বাংলাদেশে যে-রকম অস্বাভাবিক হারে নিঃস্বকরণ-প্রক্রিয়া চলছে, যে-রকম দ্রুতগতিতে গ্রামবাঙলায় কৃষকরা জমি হারাচ্ছে, তা-ও সারা দেশের উপরে নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খল এবং সাম্রাজ্যবাদের অনুগত আমলা, মুৎসুদ্দি মূলধনের প্রভাব দৃঢ়তর হওয়ার সাথে যুক্ত। এই আমলা, মুৎসুদ্দি মূলধন শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে ক্রমে জাতীয় চরিত্র অর্জন করবে, এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভারত, ব্রাজিল বা আরজেনটিনায় যা ঘটেছে বা ঘটছে, তা বাংলাদেশে হবে না নানা কারণেই। বাংলাদেশে মূলধনতান্ত্রিক ধারার বিকাশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

আর সেজন্যই জাতীয় বিকাশের প্রশ্নটি বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র-অভিমুখীন পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত, এবং তার জন্য বামপন্থীদেরই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

প্রশ্ন আসতে পারে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য তো নতুন কোনো ব্যাপার নয়! কথাটা কমবেশি সত্য। আর তা থেকেই পরবর্তী যে প্রশ্নের উদ্ভব তা হল—এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বামপন্থীরা সেই ভূমিকা পালন করতে পারলেন না কেন?

বামপন্থীরা জাতীয় বিকাশের আন্দোলনের পুরোগামী ভূমিকা এখন পর্যন্ত কেন পালন করতে পারেন নি তার কারণও খুঁজতে হবে বাংলাদেশের বাস্তবতার মধ্যেই। এদেশের গণমানসে মুসলিম লীগের প্রচারিত দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব, এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশের বৈশিষ্ট্য—যার কোনো-কোনো দিক নিয়ে সংক্ষেপে ইতিপূর্বে এই নিবন্ধের পরিসরেই আলোচনা করা হয়েছে—এইসব কারণে বামপন্থী আন্দোলন বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই কতকগুলো বিষয়গত বাধা ছিল প্রবল। এই ব্যাপারটি উপলব্ধি না করে যদি পুরো ব্যাপারটার জন্য বামপন্থী

আন্দোলনের নেতৃত্বের দুর্বলতার উপর জোর দেওয়া হয়, তাহলে শুধু ভুলই হবে না, হবে বাস্তবতাবর্জিত বিচার। আমাদের এখানে যে জাতীয় আন্দোলন বিকাশলাভ করেছে তার দুর্বলতা সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জাতীয় আন্দোলনে বুরজোয়া নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেও, এবং সেই বুরজোয়া নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন সময় দুর্বলতা দেখা দিলেও, সামগ্রিকভাবে জাতীয় আন্দোলনের ভূমিকা উন্নয়নশীল পশ্চাৎপদ দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই থাকে। এটিই উন্নয়নশীল পশ্চাৎপদ দেশের স্বাভাবিক চিত্র, এবং এখানেই বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনের মূল দুর্বলতা, বলা যেতে পারে এটাই আন্দোলনের অ্যাকিলিসের গোড়ালি। এর কারণ এদেশের মধ্যবিত্তের বিকাশের বৈশিষ্ট্য, এবং জাতীয় বুরজোয়া শ্রেণীর দুর্বলতা।

এ পর্যন্ত কথাটা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে খুব আপত্তি কারো হয় না। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের যে দুর্বলতার কথা বলা হয়, অর্থাৎ যে দুর্বলতা সমগ্র জাতীয় বিকাশকেই ব্যাহত করে, তা মনে না রাখলে এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশের সমস্যাকেও ঠিক বোঝা যাবে না। বস্তুত, উনিশ শো সাতচল্লিশের পর এদেশে নতুন করে জাতীয় বিকাশ ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে নতুন করে শুরু হয়েছে। এর আগের ঐতিহ্যের সাথে তা যেমন সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত নয়, তেমনি আবার তৎকালীন পাকিস্তানের অন্তর্গত এলাকাসমূহ বাদ দিয়ে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয় বিকাশের সাথে তা তুলনীয় নয়। মুসলিম লীগের প্রভাব দুর্বল হয়ে আসার পাশাপাশি এদেশে যেমন নতুন জাতীয় চেতনার বিকাশ শুরু হয়, তেমনি বামপন্থী চেতনারও বিকাশ শুরু হয় অনেকটা নতুন করেই। এটা ঠিকই, বর্তমান বাংলাদেশে বিভাগপূর্ব কালে কমিউনিস্ট আন্দোলন বেশ কিছু শক্তি সঞ্চার করেছিল, এবং বিকাশলাভ করেছিল বামপন্থী চিন্তাচেতনা। তার অনুষঙ্গরূপে এদেশে উনিশ শো সাতচল্লিশের পর কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব থাকলেও তার গণভিত্তি বলতে গেলে পুরোপুরিই নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল নানা কারণে। পরবর্তী সময়ে জাতীয় আন্দোলনের বিকাশের সাথে-সাথে বামপন্থী ধারাও একটু-একটু করে বিকশিত হতে শুরু করে। অনেকটা নতুন করে যাত্রা শুরু হয়। এই বিষয়টি লক্ষ না করলে এবং তার সাথে-সাথে জাতীয় আন্দোলনের উল্লিখিত দুর্বলতার প্রেক্ষিতে বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশও উনিশ শো সাতচল্লিশের পরে-পরেই কেন দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করল না, এবং জাতীয় আন্দোলনে পেটিবুরজোয়া-বুরজোয়াদের নেতৃত্ব যেহেতু দুর্বল, সেই অবস্থায় কেন নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারল না, এই-জাতীয় আপাত-টেকসই কথার অসারতা চাপা থাকে না।

বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশ, বা বস্তুত, যে কোনো আন্দোলনের বিকাশ, প্রথমত একটি অবজেকটিভ ঘটনা, এই সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না। বিষয়িগত উপাদান এই বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে পারে ঠিকই, কিন্তু বিষয়গত পটভূমি অনুকূল না থাকলে তার প্রসার হয় না। সমাজে শ্রেণীবিভাজন-প্রক্রিয়া কত দূর অগ্রসর হয়েছে, শ্রমিকশ্রেণী কতদূর বিকশিত হয়েছে, এবং সেই শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় রাজনীতিতে কী পরিমাণ সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের অবস্থান। এই বিষয়টি, এবং বাংলাদেশে যে শ্রেণীবিভাজনপ্রক্রিয়া চলছে, এখনও পর্যন্ত তা যে সুস্পষ্ট তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে নি, সে কথাটা মনে রাখলে এ পর্যন্ত বামপন্থীরা জাতীয় রাজনীতিতে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা বোঝা যাবে।

পাঁচ

কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার জন্য বাস্তবতা হল

সবচেয়ে বড়ো নিরিখ। এই বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের জাতীয় বিকাশ এবং জাতীয় আন্দোলনের গোড়া থেকে বামপন্থীরা শুধু যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে তাই নয়, এই ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ইতিপূর্বে এই ব্যাপারে যে আলোচনা হয়েছে, তা মনে রেখেই একথা বলছি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর-পর যখন সমগ্র দেশে মুসলিম লীগের প্রভাব ছিল একচেটিয়া, তখন কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল একমাত্র বিরোধী দল। জাতীয় অধিকার, গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নগুলি কমিউনিস্টরাই তখন সাধ্যমতো তুলে ধরেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পেটিবুরজোয়া-বুরজোয়া নেতৃত্বে যখন জাতীয় আন্দোলন বিকাশ লাভ করতে শুরু করে, তখন এই প্রশ্নগুলি ক্রমে জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ আর ১৯৫২-র ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনেও কমিউনিস্ট এবং বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর পর ১৯৫৪-র নির্বাচনে তাঁরাই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের প্রশ্নটি তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেন, এবং তা গঠনে পালন করেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তখন পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাংলাদেশে মুসলিম লীগের পরাজয় ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ষাটের দশকে নতুনভাবে জাতীয় অধিকার, স্বায়ত্তশাসন আর সামরিক-শাসন-বিরোধী ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং এই ঐক্যই সম্ভব করে তোলে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান।

জাতীয় রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার উপাদান সংযোজন কমিউনিস্ট আর বামপন্থীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দান। এই ব্যাপারে তাঁরা প্রথম থেকেই তৎপর ছিলেন। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের আগে কেবল জাতীয় অধিকারের দাবির পরিবর্তে তার সাথে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা এবং অবাধ মূলধনতান্ত্রিক বিকাশের বিরোধিতার উপাদানের যোজনা ঘটিয়ে আন্দোলনে নতুন মাত্রা এনে দেয়। আর তারই পরিণতিতে স্বাধীনতার পথ গ্রহণটা পেটিবুরজোয়া নেতৃত্বের পক্ষেও একরকম অবধারিত হয়ে ওঠে।

একথা ঠিকই যে, স্বাধীনতার আগে বামপন্থী শক্তিগুলি তাদের কার্যক্রম মুখ্যত জাতীয় আন্দোলনএর প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের পক্ষ থেকে সচেতন চেষ্টা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নগুলি জাতীয় রাজনীতিতে প্রধান করে তোলা সম্ভব হয় নি। পাকিস্তানের প্রেক্ষাপট, দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব, জাতীয় চেতনার বিকাশের পর্যায় প্রভৃতি বিচার করলে দেখা যাবে যে, তখন পাকিস্তানি শাসকবর্গের জাতীয় দলননীতির বিরুদ্ধে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘাতই ছিল মুখ্য। কাজেই বামপন্থীদের এ ব্যাপারে মূল দৃষ্টি দেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। আর তৎকালীন বাংলাদেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রশ্নগুলি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠাটা ছিল কঠিন। বস্তুত, জাতীয় বিকাশ কিছুদূর না এগোলে এই কঠিনতা থেকেই যায়। আর সেজন্যই এই প্রশ্নগুলিকে তীক্ষ্ণ করে তোলার মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের নেতৃত্ব বা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও, বামপন্থীরা জাতীয় বিকাশের আন্দোলনে যে ভূমিকা পালন করেছিল তা ছিল সমগ্র জাতীয় বিকাশের পক্ষে বেশ সহায়ক।

স্বাধীনতা-উত্তর কালেও জাতীয় বিকাশের প্রশ্নটির সমাধান হয়ে যায় নি। তবে এই পর্যায়ে অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রশ্নগুলি জনচেতনাতেও যেমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, তেমনি বিষয়গতভাবেও প্রশ্নগুলি আগের চেয়ে সামনে চলে এসেছে অনেক বেশি। বস্তুত, এই প্রশ্নগুলির সমাধান এবং জাতীয় বিকাশের প্রশ্নটিই প্রকট বিষয়। বুরজোয়া-পেটিবুরজোয়া নেতৃত্ব এখনো পুরো ব্যাপারটাকেই শুধুমাত্র জাতীয়-বিকাশের বিমূর্ত কথার মধ্যে সীমিত রাখতে চায়। তবে বাংলাদেশে মূলধনতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনার বিষয় আগেই আলোচিত হয়েছে। এই ধারার কোনো ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে নেই। আর সেজন্যই এই ধারায় সীমাবদ্ধ জাতীয় বিকাশের সম্ভাবনাও খুবই ক্ষীণ। আর সেজন্যই ভবিষ্যতে জাতীয় বিকাশের প্রয়োজনে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রশ্নটি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে বিষয়গত দিক থেকেই, এবং তা বিষয়গত দিক থেকে বামপন্থীদের ভূমিকার প্রসার ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করবে। বাস্তবেও আমরা জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি, শ্রমিক-আন্দোলন, খেতমজুর-আন্দোলনের প্রসার লক্ষ করেছি। কৃষক-আন্দোলন বিকাশের সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে, আর এভাবেই জাতীয় বিকাশ আন্দোলনেও সূচনা হচ্ছে নতুন পর্বের। আগামী দিনে জাতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীদের ভূমিকা গুরুত্ব পাবে। শ্রেণী হিসাবে দেখতে গেলে, বুরজোয়া-পেটিবুরজোয়া বিকাশের পূর্বোক্ত দুর্বলতার কারণে জাতীয় বিকাশের আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার গুরুত্ব বিষয়গতভাবেই বাড়বে, আর বামপন্থীরা শ্রমিকশ্রেণী আর মেহনতি মানুষকে যে পরিমাণে শ্রেণীসচেতন এবং সংগঠিত করে তুলতে পারবেন, সে পরিমাণে জাতীয় বিকাশের আন্দোলনএর পালেও লাগবে নতুন জোয়ার।

আর সেজন্যই বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতি জনগণ এবং বামপন্থীরাই ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটাই হবে বাংলাদেশের বাস্তবতায় ঐতিহাসিক ভূমিকা। বিষয়গতভাবে বামপন্থীরাও যত শক্তিশালী হয়ে উঠবে, ততই এই ভূমিকা দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে থাকবে। এটাই বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতা।

তেলনাহান

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

দূর থেকে গোল গম্বুজের মতো তেলিপুকুরের অবস্থান। পুকুর আছে। পুকুরপাড়ে তাল-জাম-বট-অর্জুনের জঙ্গল। মুর্মু হেমব্রম মাণ্ডীদের কয়েকঘর বাস। বাইরের জীবনের কোলাহল, উটকো ঝামেলা—এসবের বালাই নেই তেলিপুকুরের যেন নিস্তরঙ্গ জীবনে। শান্তসমাহিত যেন পরিচ্ছন্ন নির্জনতা আপাতত। তেলিপুকুরের যে-কোনো একটি দিকে এসে দাঁড়ালে যতদূর চোখ যায় ধু-ধু-ফাঁকা। এই ভাবটা বেশি ধরা পড়ে অঘ্রানের ধান উঠলে। বর্ষায় কচি ধানের মাথা ডিঙিয়ে জল আর জল। শরতের সময়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে সবুজে সবুজ। কার্তিকের শেষে-শেষে সবুজে সোনালি ছোঁয়া ধরে। গাছের পাতায় রোদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নীচময় উজান নামায়। কুয়াশায় ঢাকা-পড়া পৃথিবীকে শীতের রোদ চিরে ফাঁক করে তেলিপুকুরকে তুলে ধরে। তখন সবুজ কালোয় মেশামেশি গোল গম্বুজ থেকে মানুষের মাথানাড়া হাঁটাফেরা চোখে আসে। উত্তরে খড়গপুরের সারিবদ্ধ চিকমিকে আলো জরির পাড়ের রূপ ধরে সন্ধ্যার আকাশে।

বুড়ো হাড়ের মানু হেমরম হাঁফধরা বুক নিয়ে ভাবে কত্তার লীলা বটে! কবজির জোর থাকলে হাবেভাবে চালচলনে ভোগ করবার অবসর থাকে। না থাকলে লুটেমুটে যে-যার মতো বেমক্কা দফাদারি। কোন্‌টা কার, কী-সব কার—চিনবার উপায় নাই। টের পেয়ে দুনিয়াটার দিকে তাকালে জোর যার সব তার। মায়ের গভ্‌ভ থেকে খালাস পেয়ে আলো-বাতাসের জগৎটাকে ঠাণ্ডা মগজে চোখ চারিয়ে চিনতে হয়। ঢিলে-ঢালা এলোমেলো হলেই ছোঁ মেরে মানু হেমরমের বরাতটা উদোম ফাঁকা। জাড়ের দিনের লাড়া সম্বল বিলয়ে বিলের মতো।

কাশির চোটে বুকের বাতা মানুর যেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আলগা হতে চায়। গুছিয়ে নিতে গায়ে-গতরে বলের দরকার।

কাজকম্মের ডাঁসা মরদ মানু হেমরমের দিনকাল

পুইয়ে শেষ। ভারি কাঠ এক কোপে চিরে ফাঁক। এক পন ধানের আঁটি মাথার ওপর লাফিয়ে চলে। বাবুদের নজর ধরে। গাঁয়ের মুনিস চোখ টাটায়। পাড়াপড়শির গা জ্বলে। অল্প জোতের গরিব মানুষ খাটায় তাদের সম্পদ ধরে। সাঁঝের অন্ধকারে পরের রোজের চিন্তাভাবনা। কাজ সারতে কাজের ভাবনা মাথার ভিতর সুখ ধরায়। মনের মানুষ আহ্লাদের আঁচ পায়। সেই মানু আজ প্রাণের রশ্মি ছেড়ে ঘর থেকেও হাঘরি। জুয়ান ব্যাটা গতর থাকতে হাবা-পাগলা। কাজে মন নাই—গতরে যত্ন নাই। পেট বাঁচাতে যেটুকু ঘোরাফেরা। মহাকালের চিহ্ন হয়ে রান্নার ধোঁয়ামোছার ন্যাকড়ার মতো একটুকরো কাপড় পরে মানু হেমরম হাঁফিয়ে ওঠে। খড়ের অভাবে ঘরের চালে স্পষ্ট-হয়ে-যাওয়া ঘুনে-ধরা বাঁশের কালো বাতার মতো বেরিয়ে পড়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার বুকের হাড়গুলি। কাশির দাপটে মুখ দিয়ে লালা আর বসা বেরিয়ে মানু হেমরম জবুথবু অসাড়। কাশির পরেও কাশির রেশ সুরের মতো কেঁপে চলে। রক্তময় চোখদুটি দুনিয়ার জ্বালা নিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এসে মানুর পৃথিবীটিকে অন্ধকারে ভরিয়ে দেয়।

দম নিয়ে মানু ভাবে—ভাগ্‌গের যেমন তেমন—বরাতের খপ্পর বটে।

জোরে দম নিতে মানুর বুকে জোর নাই। বাতাস এদিক-ওদিক ঢুকে পড়ে তাকে হালকা করে ভাসিয়ে দেয়। বমি করে। চায়ের জলের মতো কালো রঙ তার।

শীতের হলকা বাতাস মানুকে জড়িয়ে জাপটিয়ে তার খালি গায়ে খাতির জমায়। গাছের ফাঁকফোকরে ঝরেপড়া রোদের তাত পেতে চায় মানু। ন্যাংটো মাঠে রোদ আছে। বাতাস আছে। মানুর হাঁটবার সামর্থ্য নাই।

একটা জামের গুঁড়ির ওপর শীত কাটানোর দখলদারিতে পাড়ার কচি-কচি ঝাড়গুষ্টির মাতামাতি। কোনোরকমে ঠেলে গুঁজে মানু তার আবদার রাখে। তারপর বন্ধ চোখে বাতাসে হাত উঠিয়ে ছেলেগুলিকে তাড়াতে চেষ্টা করে।

পুকুরটির চারপাড়ের তিন দিকে ঘর। কালো পচা খড়ের চাল ডাইনে বাঁয়ে। সোজা উত্তরে টিপু মাণ্ডর জ্ঞাতিগুষ্টি। তিনঘর গেরস্থ।

টিপুর ঘরে কোঠা আছে। গোরু আছে। মুরগি আছে। ধান ধরাবার গোলা আছে। গোবরনিকানো উঠোনে খড়ের গাদা আছে। দেওয়ালে হলদে মাটির রঙ ধরানো। পুকুরঘাটে নাদুস-নুদুস টিপুর ব্যাটার বউ। মাঠে খাটে না। ঘর গোছায়। ভারি মাই দুলিয়ে ঘর চালে এপাশ ওপাশ। মুরগির কঁক-কঁক ছোটাছুটি। গোরুছাগলের পাল ধরানোর তাগাদা আছে। বিয়ানি গাইটার দুধ দুয়ে চকের চায়ের দোকানে পৌঁছে দেওয়ায় পয়সা আসে।

মোটা কোমর খাড়া করে পুকুরের জল শাপলা-কই-মাগুরের টুবটুবানির ওপর দিয়ে চোখ চালিয়ে মানুর কিত্তি দেখে টিপুর ব্যাটার বউ। কানের কাছে বগল উঁচিয়ে হাই তোলে। আলগা গায়ে শাড়ি সামলায়।

গেল সনের পৌষপিঠালির হাঁড়িয়ার ধুমে টানা-টানিতে মানুর ব্যাটার মনের মানুষ ফুলমণি টিপুর ব্যাটাকে সাঙ্গা করেছে। কাজটি হয়ে যাবার পর ফুলমণির মনে হয়েছে—এ কাজটি কেমন হল! মানুর ব্যাটা রাম—চলনে-বলনে খুশি যার উপচে পড়ে দেহ থেকে। মানুষের চোখ এড়িয়ে দুজনে কত কথা মনের কথা। কালীমেলার দীর্ঘ পথে দুজনে সঙ্গী হয়েছে। পাড়ার মেয়ে ফুলমণি রামের সঙ্গে গ্রামের জোতে খাটতে গেছে। মনের মিলনে সুখ ধরে। দুজনে ভোগ করেছে সেসব। আর কিছুক্ষণের উত্তেজনায় সেই ফুলমণি আজ টিপুর ব্যাটা সিপাইয়ের বউ।

জলে কাদায় পা ডুবিয়ে আঙুলে হাজা ধরে। ধান কাটতে কোমরে বাত। ঘরের কাজে গা-গতরে আয়াস আসে। মুখিয়ার ঘরের বউ গিন্নিবান্নি ফুলমণি সুখে শান্তিতে। সুখ কী আর শান্তি কী!

পেটে দিবার পান্ত আছে। জামভরতি আমানি সুড়ুত করে পেটে ঢুকিয়ে বুকের দুধে বাড়বাড়ন্ত। বছর পুয়ান্তে আজ ফুলমণি ডাগর-ডোগর। ফুলে ফেঁপে দেহে তার সুখ বিস্তর। কোমর নুইয়ে খাটতে গেলে পেটের বাচ্চা ফড়িং লাফায়। খালাস পেলে কোলের বাচ্চা মাই পেতে আথালপিথাল। তবুও মানু এবং মানুর ছটপটানি বাপ লালনের দরদে মনটা তার উছলিয়ে। উথলিয়ে। দূর ছাই!

বয়েই গেছে। সুখ যেখানে—পেট যেখানে—মন সেখানে। দেহের সুখ না মনের সুখ? মনটা বড়ো অবাক জিনিস। ভাবলে পরে ভাবনা বাড়ায়। চাওয়া চিন্তা অভাব আছে—মন চিমসে খালাসপাওয়া পেটের মতো। সব ভরিয়ে দিলে দশ মাসের পেট। ফুলমণির বয়েই গেছে মানুর তরে দরদ দেখাতে। তবুও কষ্ট পায় ফুলমণি—বুড়া বাপের মতো সোহাগ দেখাত লোকটা!

এক-পা দু-পা ঝোপ ডিঙিয়ে মানুর গায়ে হাত রাখে ফুলমণি। মনের মানুষের বাপ! গাছের গুঁড়ির গায়ে ঠেসিয়ে দিয়ে একজাম ঠাণ্ডা আমানি মানুর ঠোঁটে ছুঁইয়ে রাখে সে।

পেট থেকে জিবটাকে তার টেনে এনে মানু জামের ভিতরে জিব চালায়—ভাত খোঁজে। ফুলমণির মেয়েমানুষের মনটায় ভাদ্রের জল জমে ফুলে উপচিয়ে ওঠে।

ষাঁড় খেদিয়ে তেলিপুকুরের আঁটা ডিঙিয়ে পাড়ে ওঠে টিপু। মানুর আমানি-খাওয়া জামটা কোমরের কাপড়ে আড়াল করে ফুলমণি ছাগল খেদায়। অর্জুন-গাছের শুকনো ফল ঝাঁটায়। বুকে ভয় ধরে। ভয়ে কাঁপতে থাকে ফুলমণি। দেখে ফেলে নি তো তার মরদের বাপটা!

ফুলমণি চোখ তোলে। ঠায় সোজা ষাঁড় খেদিয়ে টিপু তার তিন-সেরি গাইটার কাছে।

মানুর চেহারা দেখে ফুলমণি। দেখলে পরে পরান কাঁদে। দেখতে-দেখতে ক-দিনে কী দশা লোকটার! লোকটা যদি ভালো থাকত আর ফুলমণিরে যদি পেত রাম—তিনজনের গতরখাটনিতে মনের সুখে মানুর ঘরে সুখের বাড়বাড়ন্ত। অমন মানুষ রাম!

মন চাইলে পাবে ক্যানে—বরাতের খপ্পরে সেটি পাবার উপায় নাই—বিড়বিড় করে ফুলমণি। শরীরের ভিতর ব্যস্ততা। ঘরে না দেখতে পেলে টিপু-বুড়ার মন-মেজাজে আকাশপাতাল।

তুই ক্যামন আছু? মানুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফুলমণি।

কে তুই?—মানু দম নেয়। অ—

হাঁফ ছাড়ে ফুলমণি। রামের বাবা ততক্ষণে চিনতে পেরেছে তাকে।

অ বউ—পুকুরের পুব পাড় থেকে হাঁক ছাড়ে টিপু। গাইটাকে পাল ধরাতে বাগিয়ে ধরতে হবে। টিপুর ব্যাটা সিপাই মদ চোলাই-এ ব্যস্ত। কালো মস্ত ড্রাম থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে পড়ে ফোঁটা-ফোঁটা, কানকুলকাঁটার ঝোপের ভিতর!

ফুলমণি ছোটে।

ছুটতে-ছুটতে মগজটায় তার চিড় ধরে। মানুর ব্যাটা রাম আজ আট মাস দেশান্তরী—খাটতে গেছে পুবে। শ্যালোর জলে জয়া রত্না আই-আর-এ'টের চাষ। লাঙল চালানো—মাটি ভাঙা—খেতে জল ধরানো—তলা ফেলা—লাইন মেপে ধান রোয়া—আরো কত!

কাই গেছলু তুই?

কাইগ ফের—গাভিন ছেলিটাকে আমানি দেখাতে—কোমরে কাপড় জড়ায় ফুলমণি।

লে-লে ধর—ষাঁড় খুঁজে খুঁজে মোর মাথায় গোলমাল—রানিহাটীর সরকার দরে শুয়েছিল—

গাইয়ের পাল ধরিয়ে ষাঁড়টাকে মাঠের দিকে খেদিয়ে দেয় টিপু। ফিরে এসে গাইকে স্নান করাতে পুকুরে নামে। খড় দিয়ে গোরুর গা ঘসে।

ঘাটের দুপাশের শুশনি শাকে আঁচল ভরায় ফুলমণি। দোপাখা উনোনের ওপর কালো হাঁড়িতে ভাত ফোটায়। বাঁ হাতে উনোনে খড় ঢোকায়—ডান হাতে কাঠের চাটু নাড়ে।

ভাত ফোটে। আগুন জ্বলে। মাথার ওপর রোদ বাড়ে। ফুলমণির মগজ জ্বলতে থাকে।

সিপাইয়ের সব আছে। জোতজায়গা ধান চাল গোরু ছাগল মুরগি মদের ব্যাবসা পয়সাকড়ি সমর্থ বাপ—সব। ফুলমণির গা-গতরের ভাবনা তারা করে না কেউ। ফুলমণি থাকলে কী আর না থাকলে কী—

রামের ছিল সে—আর দুজনের গা-গতর। গতরকে কাজে লাগাবে শক্তি থাকবে। কাজ না পেলে আলিস্যি—কেবল ফুলেফেঁপে ঢোল। ঘরসারানি গের-স্থালি কাজকম্মো ওসব গায়ে লাগে না। খেতের কাজে বিলের কাজে কোমর টাটায়—পায়ে হাজা ধরে।

তা হোক! রাতের বেলা মরদের দেহের নীচে দরদ আহ্লাদ ছিটকে পড়ে। যত পার খুশিমতো কুড়িয়ে নাও—জুটিয়ে জমা করো। টিপুর ব্যাটার ঘর করতে সেটি পাবার উপায় নাই। হাড়িয়া ছেড়ে মদের নেশা। মদ তৈরি—চালান দিবা—অত সময় কোথা সিপাইয়ের।

ফুলমণির মাথা ধরে। মাথায় হাত রাখে সে। আগুনে খড় জ্বলে। দেহ জ্বলে। চোখ জ্বলে।

সিপাইয়ের বাবা টিপুর তরেই আজ মানুবুড়ার অমন দশা। কে না জানে দেশের আর-পাঁচজন! মুখ ফুটিয়ে গলা বাড়িয়ে—কারোর কোনো সাহস নেই—জোর যার বল তার!

দেখবার লোক নাই মানুর। অসুখে ওষুধ নাই। পেটে ভাত নাই। একলা ব্যাটা অমন জুয়ান রাম—সে-ও আজ আশা ছেড়ে বিবাগী বনেছে। আর টিপুর একলা ব্যাটা সিপাইয়ের সকল দিকে বাড়বাড়ন্ত। কত্তার জোরে বরাত বটে! বরাতের জোরে কী ছিনু আর কী হনু!

যার আছে—তার আসে। যার নাই ত তার নাই।

ফুলমণি বুকের বাতাস ছাড়ে। দু হাতে চোখ রগড়িয়ে দু চোখের জ্বালা কমায়।

টিপু আর মানুর বহুকালের ঝগড়ার কথা—সেসব রামের মুখে, নিজের বাপ বাসুর মুখে শুনেছে ফুলমণি।

সাদাসিধে সহজ মানুষ মানু বন্ধু মেনে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলে। টিপুর সঙ্গে ভাব জমায়। মেলামেশা উঠাবসা। কিন্তু আগড়ার আগুনের মতো রাগ জীইয়ে আখের গোছায় টিপু। রামের মায়ের অসুখের দিনে জলের দরে মানুর জমি টিপুর কাছে হাতবদল হয়। রামের মা মরে। টিপুর ভাগ্য ঘোরে। অভাব-অনটনে টিপুর জোতেই খাটতে যায় মানু। পয়সা-কড়ির গণ্ডগোলে অভাবে পাগলা মানু দু-দশটা কথা শোনায়। বিপদ দেখে টিপু মগজ খাটায়। কাত্তিকের গোরুখুটানির সময় ধামসা মাদলের ধপ-ধপানির দিনে মানুকে হাড়িয়ার সঙ্গে জড়ি করে টিপু। গণকের কাছে তেল দেখিয়ে মানু সব বুঝতে পারে। কিন্তু ততদিনে মানুর দেহের বলটল সব শুকিয়ে কাঠ। গতর তার পোকায়-খাওয়া ধানের মতো লিক লকে সরু। হাড়পাঁজরায় জোর নাই। মন-মগজ কাজ করে না। কাজেকম্মে বুদ্ধিসুদ্ধিতে মাথা খাটে না। গ্রামের মুখিয়া মাতব্বর হ'য়ে চেপে বসা টিপুর আসন টলাবে কে?

টিপুর জোতজমিতে খাটতে যাবে সকলে।

রাত পুয়ালে কাজ চাই।

কাজ দেবে কে?

কাজ সারলে পয়সা আসে।

পয়সা না থাকলে খিদার জ্বালায় ভাত জোগাবে কে? ততদিনে রামের আরো কাছে এসেছে ফুলমণি। অভাব-অনটনে সুখদুঃখের কথা বলেছে। আড়ালে আবডালে মনের কথা বলে বসেছে। দুঃখের আঁচে মনের মানুষ পরস্পরের কাছে এসে মনের তাত বদল করেছে।

হিসেবের গণ্ডগোলে যেদিন সব পালটে গেল সেদিন অবাক হয়ে কপালে হাত চাপড়েছে ফুলমণি। পাগলের মতো ঝোপের অন্ধকারে রাম আর সে দুজন দুজনের মুখ দেখেছে। গোল-গোল চোখ তুলে

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখেছে। অমন ডাবা-ডাবা চোখে বিস্ময় ঝরে পড়েছে।

সুখের লেগে টানা-হেঁচড়ায় মাখা গলিয়েছিল ফুলমণি। ছুঁওর বাপলায় খরচা আছে। আত্মীয়বন্ধুদের স্ফূর্তি আছে। টানাহেঁচড়ায় সাঙ্গা করলে রামের সেসব খরচ নাই—পণের ঝামেলা নাই। হাড়িয়ার নেশায় মগজ খাটে না। মনটাকে উড়িয়ে দিলে উড়ে যায়। বাঁয়ের পা ডাইনে ফেলে ডাইনের পা বাঁয়ে ফেলে মাদল বুয়ায়-কাঁসির তালে তাল ধরানোর মজা আসে। নেশাটা জেঁকে বসে। তাগদআলা জুয়ান মরদ সে সুযোগটি নিতে ছাড়ে না।

রামের বদলে টেনে ধরে সিঁদুর লেপেছে টিপুর ব্যাটা সিপাই। মুখিয়ার ব্যাটা সিঁদুর দিয়েছে—সমাজে আইন আছে। মনের মানুষ ছেড়ে পরপুরুষে গতর ঠেসাবে—সমাজে কানুন আছে। নিয়ম মান নাই দেবতার কোপ আছে—ডাইনে খাবে!

মানুষের বরাত বটে!

শ্বাস ছেড়ে বুকের কষ্ট হালকা করে ফুলমণি। বুড়া বাপের ঝক্কিঝামেলা একা পুয়াবে, সে সাধ্যি রামের কী!

ধান উঠেছে, মাঠ ফাঁকা। খাড়াভরতি মাঠে কাজ নাই। গেরস্থের ঘরের ধোয়া মোছা—ও করতে মুনিস লাগে না। কাজের খোঁজে কাজ পেয়ে রাম তাই পুবের বিলে—বুড়া বাপ তার গেল থাকল!

ফুলমণির ভাত ফুটে যায়। তরকারির জোগাড়ে বাড়ির মুলোবেগুনে চোখ চারানো। শুটকি মাছ জলে ভেজানো—ফুলমণির কাজ কত।

গোরুছাগলের খাবানদাবান। শেয়ালের গলায় মুরগি গেলে চোখ ফেলা। বাজের চোখ থেকে মোরগের বাচ্চা আগলানো। জামগাছের শুকনো ডাল ভেঙে জ্বালন তৈরি। অর্জুনফল ঝাঁটিয়ে জমা করা। টিপুর চোখ এড়িয়ে মানুষকে আর-এক খেপ ভাত খাইয়ে ফুলমণি তার কাজে ব্যস্ত হয়।

ফুলমণির লুকানো নজরদারিতে এই শীতটা কোনো-রকমে কাটিয়ে সামনের শীতে বমি-রক্ত-গুয়ে-মুতে মানু হেমরম মরে গেল।

মরার সময় ঘোলাটে লাল চোখে ঝি-ব্যাটার মুখ দেখেছে মানু। জগতের আলো বাতাস পেটে ভরে অবাক হয়ে ফুলমণির মুখে চোখ রেখেছে সে। ফুলমণিকে চিনতে বোধহয় কষ্ট পেয়েছে। চোখের কালো গোলটা স্থির ধরে চিড়চিড় করেছে মানু। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলে ফুলমণির গায়ে হাত তুলতেই হাত তার টপ করে খসে পড়েছে।

মরে যাওয়ায় ঝি-ব্যাটা আর ফুলমণির কান্না শোনা হয় নি তার।

মানুষকে নাড়া-ঘাটার সুযোগ হারিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জলে পুকুর তৈরি ফুলমণির। মুখ পর্যন্ত পুকুরের জলে ফুলমণির চোখের জল পড়েছে। সেসব কারোর চোখে পড়ে নি।

ধান কাটা-তোলার মরশুমে তেলিপুকুরে বিবাদ হুমড়ি খেয়ে পড়ায় টিপুর কিছু অসুবিধে হয়। মানুষটা তাকে মরে গিয়েও জ্বালিয়ে গেল যেন। বেঁচে থাকলে যেমন তেমন—মরে গেলে দুঃখু করতে হয়। টিপু তার মনের দুঃখ ধরে রাখতে পারে নি! একটা গাছ দিয়েছে সে। মড়ার 'রাপা' সারা—সে বিস্তর ঝক্কি ঝামেলা। টকটকে সবুজ জীবন্ত বাঁশটার গা নাড়িয়ে টিপু জীবনের হাঁফ ছাড়ে।

আকাশে হাই তুলে বাঁশঝাড়ের ডগা দেখে। এধার ওধার ডাহুক দৌড়ায়। কাঠবেড়ালী, ডামা লাফায়।

শত্তুর মানুষের মরণ দেখে এত খুশিও ধরতে পারে মানুষ! ঠাকুরের খেলা বটে!

বটঝুরির গোড়াটায় সিঁদুর-লেপা পাথরে চোখ ফেলে ভারি মাথাটা তার নুইয়ে ফেলে টিপু। দু হাত ঘুরিয়ে আলোবাতাসের লীলাখেলা ভোগ করে। আনন্দে দু চোখে জল উপচে পড়ে।

যেন নেড়িকুত্তার কুঁই-কুঁই শব্দ শুনে পিছনে

তাকিয়ে দেখে টিপু, ব্যাটার জুয়ান বউটা তার ঝোপের ভিতর কেঁদে-কেটে আথালি পিথালি।

মানুর ঘরের সামনে খোলা বাইরে থুথু কফ আর পায়খানার পাশে উত্তরে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছে মরা মানু। ডান হাতটার পাশে তার এক জায়গায় কাঁচা গোবরের 'ছোঁচ'। টাটকা ভারি গন্ধের গোল বৃত্ত।

মানুর যাওয়ার আগের শেষ কাজে তার ঘরের লোক দরকার তিনজন। কিন্তু কুল সামলাতে একটা ব্যাটা তার সম্বল। একা রাম-ই তিনবার তিনমুঠো ধান দেয় মরা মানুর হাতে। চেয়ে-চিন্তে এটা জোগাড় করেছে মানুর জুয়ান ব্যাটা রাম।

গু-মুতের গন্ধ নিয়ে সবুজ বাঁশের 'ভাড়ি'-তে চেপে মানুর মড়া শ্মশানে চলে।

হরিবোলের শব্দে তেলিপুকুরের তালবনে চাম-চিকেরা ছটফট করে। বটগাছের মাথায় বাদুড়েরা ব্যস্ত হয়।

চিতা সাজালে মানুষ উত্তরের মাথা দক্ষিণে যায়। মানুর ব্যাটা রাম তার ময়লা গামছা থেকে সুতা টেনে বাঁশকঞ্চির মাথায় জড়ায়। 'ব্যামনা'-র আগুন থেকে আগুন নিয়ে বাপের মুখে আগুন দেয়।

আগুনের রঙ তখন ফ্যাকাশে লাল। শীতের আগুনে তেজ কম। সূর্যডোবায় অন্ধকারে মানুর চোখের লাল রঙ আগুনে মিশে লালে লাল। তির্যক ভঙ্গি নিয়ে লাল আগুন টিপুর দেওয়া কাঠের ভিতর মানুকে পুড়তে থাকে।

মানুকে-পুড়তে-আসা তেলিপুকুরের সকলে যে-যার মতো ক্লান্তি-বিষাদ-সাফল্য নিয়ে ঘরে ফেরে।

রাত বাড়ায় অজ্ঞানের ঠাণ্ডা বাতাস জেঁকে আসে। শিশিরে পা ভেজে।

মানুর 'অস্থি' কলসিতে চড়ে মাটির ভিতর নিজের ভিটেয় জমা থাকে।

ন-দিনের দিন রামের বাপের তেলনাহানে তেলি-পুকুরে উৎসবের মেজাজ। ছেলেছোকরার মজা—হাড়ি-য়ার গড়াগড়ি।

মুর্মুদের নাপিতটার সামনে বসে পাড়ার লোক চুল কাটবে প্রথমে। দাড়ি কাটবে। নখ কাটবে। নেশার ঘোরে দুঃখী মানুষ যে-যার মতো গল্প করে। সুখদুঃখের কথা বলে—রোজগারের হিসেব মেলায়। টিপুর গোলার ধানের হিসেব করে। রামের ভাগ্য ভেবে কাতর হয়।

মুখফেরতি সেসব কথা টিপুর কানে আসে। মুচকি হেসে জবাব দেয়। কাজের ভানে ব্যস্ত হয়।

হঠাৎ রামের পাগলামোতে চমকে নড়ে উঠে সকলে। দুঃখ আর নেশার ঘোরে আবেগে নাপিতকে ছুঁয়ে দিয়েছে সে। জড়িয়ে ধরে কষ্টের কথা জানিয়েছে। প্রথাভঙ্গের শাস্তি আছে। হাড়িয়ার দামে উসুল হবে সেসব।

অগত্যা প্রথমে রামের চুল কাটতে হয় নাপিতকে। পরে-পরে পাড়ার সব।

পড়ন্ত বেলায় সূর্যের মরা আলো তেলিপুকুরের গাছের ফাঁক দিয়ে জলের ওপর।

গাছের জীবেরা যে-যার মতো জায়গা ধরেছে। বামুন-কায়েতের গ্রাম থেকে মাঠ ডিঙিয়ে শাঁখের শব্দ রামের শোকে মাথামাখি।

স্নানের সময় বেশি ঠাণ্ডা এল। ঠাণ্ডায় জলের ঠাণ্ডা। তেলের ভাগাভাগি। নাপিত পাবে আলাদা তেল। গ্রামের লোক পাবে আলাদা তেল। মানুর ঘরের থেকে রাম পাবে আলাদা তেল।

গ্রামের লোকের তেলে ভাগ বসিয়ে ফুলমণি পায়ের চামড়ায় তেল ঘসে। একার তেলে হাত ডুবিয়ে তেলে-তেলে শরীরটাকে ভিজিয়ে ফেলে রাম। গায়ে তেল পড়ে তো গা ভালো থাকে। চামড়া সেঁদে ঠাণ্ডা ভেতরে ঢুকতে পায় না।

ভিড়ের ভিতর ফুলমণির পেটের ডৌলটা দেখে রাম। প্রায় কুড়ি মাস পর ফিরে এসে বিপদের চাপে ফুলমণিকে দেখা হয় নি তার। নেশার ঝোঁকে চোখগুলো রামের নুইয়ে পড়ে। বছর ফিরতে সিপাইয়ের হাতে পেট বানিয়েছে ফুলমণি।

তেলমাখার পর খইলের পচুই মেখে রাম আগে জলে নামে। জলে দাঁড়িয়ে শীত তাকে ঠকঠক কাঁপিয়ে রাখে।

গ্রামের সকলের স্নান সারা পর্যন্ত জলের ভিতর রাম। জলের অন্ধকারে রামের কালো চামড়া মিলে মিশে অন্ধকার—

টিপু বুড়া রে, তুই এমন কেন?
বরাতটা রে, তুই এমন কেন?
বাপটা রে, তুই এমন কেন?
ফুলমণি রে, তুই এমন কেন?
সিপাই রে, তুই এমন কেন?
টিপু বুড়া রে, তোর তরে তো বাপটা মোর—

ঠাণ্ডায় হিম-বরফ অচেতন রামকে সবার শেষে ডাঙার ওপর নাপিত টেনে তোলে। নাপিত পায় চার সের চালের একহাঁড়ি হাড়িয়া। এবার হয় তেলনাহানের আসল কাজ 'ঝুপার'।

গ্রামের তিন মাতব্বরের এক মাতব্বর মুখিয়া টিপু রামের দাওয়ায়।

মরা মানুষ উদ্দেশ্যে ঝুপার।

মারাংবুরু সেজে বসেছে গ্রামের মুখিয়া টিপু বুড়া।

টিপুর মুখ দেখে ক্লান্ত রাম। দেখে আর দেখে। চোখ দুটো ঝিমিয়ে আসে।

ধর্ম সেজে ধর্ম করে টিপু বুড়া মারাংবুরু। ডহ হেমরম 'পুরুধুল'। হাড়ো কিসকু 'গজহ'। হাড়োর মুখ দেখে রাম। তার বাপের আত্মা হয়ে দাওয়ায় বসে হাড়ো কিসকু।

দাওয়ায় পাতা এক নতুন গামছায় পাশাপাশি তিন মাতব্বর। টিপু হাড়ো ডহ। তিনজনের সামনে তিন 'মাহালি'—নতুন কুলো।

তিন কুলোর ওপর তিনমুঠো করে আতপ চাল দেয় রাম।

কুলোর ওপর চাল ঘসে-ঘসে তিনজনে মন্ত্র পড়ে। সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে। বাইরের জ্ঞান থাকে না। 'দেশবালা' পুটরু মোড়ল গজহকে প্রশ্ন করে। হাত ঘুরিয়ে পুটরু বলে—তুই এমনি মরছু, না ডাইনে মারছে?

রোগে মরছি। গজহের চোখ বন্ধ।

ভয় পাবি নি—ঠিক করে ক—

যা কইছি তা কই.ছ—ওষুধ পাইনি রোগে মরছি। পুটরুর চোখ বড়ো হয়। চেঁচিয়ে রেগে ওঠে। তেড়ে মারতে চায়। সে শব্দে তেলিপুকুর সাড়া তোলে। নেশার ঘোরে মাতাল রাম ডাবা-ডাবা চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। কাণ্ড দেখে। মজা দেখে।

—আগের রাগ ছিল—হাঁড়িয়ার সঙ্গে জড়ি করছিল মোকে—তাতেই মোর রোগ বাধল—সে রোগ আর সারল নি কুনদিন—

—কে করছিল?
—সে মুই কইতে পারব নি—
—ক্যানে?
—না।

তেলিপুকুর কানে-কানে কথা বলে।

—তবে রোগেই মরছু তুই?
—হ্যাঁ।
—ডাইনে?
—না।

পুটরা দম নেয়।

সবাই শোনে গজহের কথা। মরা মানুষ আত্মার কথা। মানুষের আত্মা দেহ ছাড়লে দেবতা হয়। দেবতারা ধর্ম মানে। মিথ্যা বলে না। মিছা বলায় জিব খসে।

কানে-কানে ফিসফিস শব্দ ওড়ে। সামনে ধর্ম মারাংবুরু। জোর গলায় কথা বলবে সে সাধ্য আছে কার!

পিছনে হাসির শব্দে কান খাড়া করে সকলে। চোখ ঘুরিয়ে দেখে।

তারপর কাজে মন দেয়।

গজহের কুলোর চাল থাকে আলাদা। বাকি দুটো কুলোর চাল মিশিয়ে আলাদা।

রামের কাছ থেকে জল চায় গজহ। নাম ধরে ডাকে—রাম রে—বাপ্—ও বাপ আয়—জল দে—

হাসি থামিয়ে উঠে আসে রাম। গজহের হাতে—বাপের আত্মার হাতে হাড়িয়ার জল উপুড় করে ঢালে।

উৎসব নিয়ম অনুষ্ঠান জাঁকিয়ে ওঠে। রাত বাড়ে। শেয়াল ডাকে। ধানের মাঠে জাগালি চেঁচায়। তেলিপুকুরে আজ শব্দ আছে।

উঠোনভর্তি লাল রক্তের দাগ। জ্যান্ত মুরগির মাথা কেটে ছেঁচা হয়। মুরগির মাথা দিয়ে কুলার চাল রান্না হয়। তা হাড়িয়ার চাঁট হয় রামের বাপ মানুষ তেলনাহানে।

টাটকা মাংসের চাঁট দিয়ে ভোর রাতে ভোজ মারে তেলিপুকুরের সাঁওতালেরা। হাড়িয়ার খালি হাঁড়ি উঠোনে গড়তে থাকে। হাড়িয়া-চাটা কুকুরের দল চেঁচিয়ে মাত করে।

ধানভর্তি মাঠে টিপুর ছাগালি চেঁচায়। চোরের হাত থেকে ধান আগলায়।

হাড়িয়ার শেষে সিপাইয়ের মদ আসে। মাঠ-ভর্তি পাকা ধানের গন্ধ—সিপাইয়ের মদের গন্ধ—তেলিপুকুরের মানুষের গন্ধ বাতাসে জমাট বাঁধে। ভাড়া-করা হেজাকের আলোর চারপাশে গোল হয়ে তেলিপুকুরের মানুষগুনেরা।

গল্প করে। খুশিতে আনন্দের কথা চলে। টিপুর উৎসাহে নিজেদের মাতিয়ে রাখে তারা। হঠাৎ অন্য-রকমের শব্দে কান খাড়া করে সকলে। এধার ওধার ঘোলাটে চোখ চারায়। তারপর হো-হো করে যে-যার গলায় হেসে ওঠে। খাওয়াতে মন দেয়। গোল হয়ে নাচতে থাকে। খুশিতে—আনন্দে মানুষ উঠোনে ধুলো ওড়ে।

কিছু না। দুটো মাতাল। মাগি-মদ্দ। নেশার ঘোরে নিজেদের জড়িয়ে ধরে বুকের কষ্টের কথা বলতে চেয়েছে……

মহাক্ষণের প্রতীক্ষায়

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

"যে-শিল্প তার সমসাময়িক কালকে ধরতে ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা না-করে সে শিল্প জীবন্ত নয়।"

(প্রসঙ্গ নাট্য, পৃ. ১৫৩)

কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের অবস্থা যে নানা দিক থেকে অত্যন্ত সংকটাপন্ন—একথা বাঙলা নাট্যজগতের কর্মী থেকে শুরু করে দর্শক অবধি সবাই জানেন। এমনকি মূল সমস্যাগুলো যে কী সে সম্পর্কে অনেকেই ওয়াকিবহাল। একটা তালিকা দেওয়া যাক—মৌলিক মঞ্চযোগ্য নাটকের অভাব, দর্শক-সংখ্যার ক্রম-বিলুপ্তি, নাট্যকর্মীদের বিলীয়মান উৎসাহ-উদ্দীপনা, দলে অন্তর্বিরোধ আর ভাঙন, ভালো প্রেক্ষাগৃহের দুষ্প্রাপ্যতা, অভিনেত্রী-সমস্যা এবং সর্বোপরি বিজ্ঞাপন, নিয়মিত 'শো' এবং নতুন প্রযোজনার খরচ জোগানোর জন্য যথেষ্ট অর্থের অভাব। সমস্যাগুলো আবার বিচ্ছিন্ন নয়, একটা আরেকটার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। প্রায় প্রত্যেকটি সমস্যারই আলাদা-আলাদা বিশ্লেষণ এবং সমাধান খোঁজার চেষ্টা বিভিন্ন সময়ে করা হয়েছে, কিন্তু সব প্রয়াসই শেষ পর্যন্ত অন্ধের হাতি দেখায় পর্যবসিত হয়েছে; মুমূর্ষু রোগীর রোগ সারে নি, বরং বেড়েই চলেছে। তবে কি আপাত দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে যে লক্ষণগুলো, তা আসল রোগের বাহ্যিক প্রকাশমাত্র? উত্তরের জন্য বাঙলা নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে একবার তাকানো যাক।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে চল্লিশের দশক নানা কারণে এক উল্লেখযোগ্য দশক। সারা দেশের জনমানসে এবং জাতীয় জীবনে সেটা একটা আলোড়নসৃষ্টিকারী সময়। একদিকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদের পতন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ, সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ্বরাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি, অন্যদিকে জাতীয় পটভূমিকায় কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ৪২-এর স্বাধীনতা-আন্দোলন ও গণবিদ্রোহ, মার্কসবাদী চিন্তাধারার বিকাশ, দুর্ভিক্ষ, কৃষক-আন্দোলন, দেশবিভাগ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—ভারতবর্ষের মানুষ আর সমাজকে ইতিহাসের ঘটনাবহুল আবর্তের মধ্যে ঠেলে দিল। ঐতিহাসিক মন্থনে জন্ম নিল এক নতুন চেতনা যার পরিণতি হিসেবে ১৯৪৩-এর মে মাসে, ভারতের কমিউনিসট পার্টির অধিবেশনের ঠিক আগে, তৈরি হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সংগঠন।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই বাঙলা নাট্যজগতে এক নতুন যুগের সূচনা হল। উনবিংশ শতাব্দীতে নাটক বিভিন্ন সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরিক হলেও গণনাট্য আন্দোলন ছিল না। ঠিক পূর্ববর্তী যুগের বাঙলা নাটক ছিল জীবনবিমুখ, প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে বন্দী, সাধারণ মানুষের সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু গণনাট্য সংঘ নাট্য-আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্ত দেশের মানুষের জীবন এবং মানসিকতাকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করল। নাটক প্রেক্ষাগৃহের গণ্ডি ছেড়ে এসে দাঁড়াল মানুষের দোরগোড়ায়। 'জবানবন্দী' (১৯৪৪) বা 'নবান্ন'-র (১৯৪৪) মতো নাট্য-প্রযোজনা করে গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা সচেতনভাবে নাটককে সমকালীন সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টা করলেন।

যদিও গণনাট্য সংঘের কয়েকটি দলিলে একে কমিউনিসট পার্টির সংগঠন হিসেবে অস্বীকার করা হয়েছে, তবু এর প্রাণশক্তি ছিল কমিউনিসট পার্টির রাজনৈতিক দর্শন এবং মতাদর্শ। চল্লিশ দশকের বামপন্থী আন্দোলনের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে গণনাট্যের কর্মচাঞ্চল্য। ১৯৪৬ সালে গণনাট্য সংঘে যে ভাঙন ধরল তার প্রত্যক্ষ কারণ রাজনৈতিক নেতা আর শিল্পীদের মতবিরোধ হলেও, হয়তো পরোক্ষভাবে কমিউনিসট পার্টির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আর বিভ্রান্তি, যা ১৯৪৮ সালে আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করবে, এর জন্য দায়ী। আবার এটাও ঠিক যে, গণনাট্য আন্দোলন সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রচণ্ড সামাজিক-রাজনৈতিক আলোড়নকে সাংস্কৃতিক রূপ দেবার দায়িত্ব নিয়েছিল তাকে সংহত করার মতো দূরদর্শী প্রকল্প বা কাঠামো তার ছিল না।

বাঙলা নাটকের পটভূমিকায় এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা গণনাট্য আন্দোলন থেকে সরে এসে ১৯৪৮ সালে শ্রীশম্ভু মিত্রের 'বহুরূপী' নাট্যদল গঠন। শ্রীমিত্র গণনাট্য আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং তাঁর ও শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের যৌথ পরিচালনায় "নবান্ন" নাটক অভিনীত হয়। বহুরূপীর জন্মলগ্নের সঙ্গে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের[১] জন্মলগ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। এখানে বলা দরকার যে গণনাট্য সংঘের নাট্যদর্শন বাঙলা 'নবনাট্যের' প্রেরণা জোগালেও এই দুই আন্দোলনের স্বরূপ এবং আদর্শ মূলত ভিন্ন।

গণনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের হাতে থাকলেও তার সর্বশেষ লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনগণের চেতনা এবং মানসিকতাকে সাংস্কৃতিক প্রকাশের দিকে পরিচালিত করা। কিন্তু 'বহুরূপী' যে নাট্য-আন্দোলনের সূচনা করল তা মূলত শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তা আর উপলব্ধির রূপায়ণ। নিতান্ত প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ ছাড়াও, ব্যক্তিমানুষ ও রাজনৈতিক সংগঠনের সম্পর্কবিচার, রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপনির্দেশ, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সংঘাত, এবং সাধারণভাবে সর্বস্তরে মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—'বহুরূপী'-প্রযোজিত নাটকগুলির উপজীব্য হয়ে উঠল। গণনাট্যের সহজবোধ্যতা থেকে সরে এসে, ধ্রুপদী নাটকের প্রযোজনায়, দর্শকের রুচি আর চিন্তা তৈরি করার দায়িত্ব নিয়ে 'বহুরূপী' ব্যবসায়িক থিয়েটারের বিকল্প সুস্থ নাট্যপ্রচেষ্টার ইতিহাসের সূচনা করল।

এই নাট্য-ইতিহাসের আরেকটি বিশিষ্ট ধারার বিকাশ ঘটল পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি। শ্রীউৎপল দত্তের 'লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ' (১৯৫৩; ১৯৬৯ থেকে

পিপল্‌স্ লিট্‌ল্ থিয়েটার) ইংরেজি নাটকের প্রয়োজনা থেকে তাঁদের সৃজনীশক্তিকে বাঙলা নাটকের প্রয়োজনায় প্রবাহিত করলেন। তাঁদের নাট্যদৃষ্টির কেন্দ্রে ছিল সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতির বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। এঁদের গোড়ার দিকের প্রযোজনায় গণনাট্য সংঘের রাজনৈতিক চিন্তা কাজ করলেও সেই উদ্দেশ্য ছিল না, তাই সূক্ষ্ম নাট্য-প্রয়োগ ও আঙ্গিকের প্রয়োজনে প্রেক্ষাগৃহই এইসব নাটকের যথার্থ প্রযোজনাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। পরে অবশ্য বৈপ্লবিক থিয়েটারের রূপায়ণে এবং বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছনোর জন্য এঁরা পথ-নাটিকা, যাত্রা ইত্যাদি মাধ্যমকেও ব্যবহার করেছেন।

'বহুরূপী' যে নাট্যবেগকে মুক্ত করেছিল তারই স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে একে-একে প্রতিষ্ঠিত হল 'থিয়েটার সেন্টার' (১৯৫৪), 'রূপকার' (১৯৫৭), 'শৌভনিক' (১৯৫৭), 'গন্ধর্ব' (১৯৫৭), 'সুন্দরম' (১৯৫৭), 'নান্দীকার' (১৯৬০), 'রূপান্তরী' (১৯৬১)', 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' (১৯৬৬)-এর মতো বিশিষ্ট নাট্যদল। সত্তরের দশকেও এই কলকাতা শহরের নানা প্রান্তে একই সঙ্গে তৈরি হল অসংখ্য 'গ্রুপ', যাদের মধ্যে কতিপয় মাত্র বাঙলার নাট্য-ইতিহাসে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখতে পারল—'চেতনা' (১৯৭২), 'থিয়েটার কমিউন' (১৯৭২), 'নান্দীমুখ' (১৯৭৭) এবং 'শূদ্রক' (১৯৭৭)। গ্রুপ থিয়েটারের জন্মমুহূর্তে যে গভীর উৎসাহ আর প্রেরণা কাজ করেছিল তা সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে স্বতোৎসারিত। বহু ঐতিহাসিক এবং আদর্শগত বিপর্যয় পেরিয়ে এসে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ তখন এক সৃষ্টিশীল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে। সারা দেশ জুড়ে কর্মচাঞ্চল্য, নব উদ্যমের জোয়ার গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি। ১৯৫০-এ ভারতবর্ষকে 'ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, সোভিয়েত রাশিয়ার অনুসরণে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, বিধান রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে পশ্চিমবঙ্গে তখন সর্বস্তরে ব্যাপক সম্প্রসারণ চলেছে—এই অবস্থায় বাঙালি শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত একদিকে আশ্বাস পেয়েছে সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তার, অন্যদিকে স্বপ্ন দেখছে সামাজিক বিপ্লবের, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা তখন বুদ্ধি ও আদর্শগত নেতৃত্বের। শিক্ষা, বুদ্ধি, মনন-শক্তিকে এই শ্রেণী তখন শুধু নিজস্ব পরিপার্শ্বের পর্যালোচনাতেই নয়, সামগ্রিকভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণে কাজে লাগিয়েছে। পঞ্চাশের দশকের নাট্যপ্রযোজনাগুলোতে একদিকে যেমন সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতিফলন ঘটেছে, অন্যদিকে তা সমাজ এবং রাজনীতির সমালোচনাকেও রূপায়িত করেছে। এই প্রসঙ্গে যে প্রযোজনাগুলোর নাম প্রথমেই মনে হয়—'পথিক' (বহুরূপী-১৯৪৯), 'উলুখাগড়া' (বহুরূপী-১৯৫০), 'ছেঁড়া তার' (বহুরূপী-১৯৫০), 'বাংলার মাটি' (রূপকার-১৯৫৬), 'মা' (শৌভনিক-১৯৫৭), 'পুতুলখেলা' (বহুরূপী-১৯৫৭), 'সূর্যলগ্ন' (গন্ধর্ব-১৯৫৭), 'নীচের মহল' (এল. টি. জি.-১৯৫৯), 'দুখীর ইমান' (রূপকার-১৯৫৯), 'অঙ্গার' (এল. টি. জি.-১৯৫৯)। পঞ্চাশের দশকের প্রধানত 'বহুরূপী'র কয়েকটি প্রযোজনায় আরেকটি ধারা লক্ষ করা যায়—ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ, রাজনীতি বা প্রশাসনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ—'দশচক্র' (১৯৫১), 'চার অধ্যায়' (১৯৫১), 'রক্তকরবী' (১৯৫৪)। এই নাটকগুলি প্রযোজনার মাধ্যমে 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা দ্বিতীয় বার নজির সৃষ্টি করলেন।

পঞ্চাশের দশক থেকে ষাটের দশকের গোড়া পর্যন্ত শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্তের এক ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্থিতির অনুভব হয়েছিল, একথা আগেই বলা হয়েছে। তাই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পক্ষে তার দৃষ্টি এবং মননকে মানুষের প্রত্যক্ষ পরিমণ্ডল থেকে সরিয়ে বৃহত্তর মানবিক পরিস্থিতির পর্যালোচনায় লাগানো সম্ভব হল। এরই পরিণতি হিসেবে ষাটের কিছু-কিছু নাটকে দেখা গেল চিরন্তন নিরিখে মানুষের অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস—'রাজা আদিপাউস' (বহুরূপী-১৯৬৪), 'রাজা' (বহুরূপী-১৯৬৪)। প্রসঙ্গত, বহুরূপীরই আগের একটি প্রযোজনায়—'ডাকঘর' (১৯৫৭)—এই চিন্তার বীজ লুকিয়েছিল। ব্যক্তি এবং তার সামগ্রিক পরিবেশ বিশ্লেষণের সূত্র ধরে এবার নাটকে এসে পড়ল আধুনিক সমাজে ব্যক্তির একাকিত্ব ও নৈরাশ্যের রূপায়ণ, তার বিপন্ন অস্তিত্বের চিন্তা—'জনৈকের মৃত্যু' (চতুর্মুখ-১৯৬৫), 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (শৌভনিক-১৯৬৫), 'বাকি ইতিহাস' (বহুরূপী-১৯৬৭)। এ ছাড়া সাধারণভাবে পাশ্চাত্য নাটকের প্রযোজনার প্রতি একটা ঝোঁক দেখা গেল এসময় যার সূচনা প্রগতন নান্দীকার গোষ্ঠীর হাতে। ফলত, বাঙলা নাটকে এমন কতগুলো বিষয় এসে পড়ল যার সঙ্গে দেশের মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তেমন কোনো যোগ ছিল না। অস্তিত্ববাদ, কিমিতিবাদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নাটক লিখিত এবং প্রযোজিত হতে লাগল—'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' (নান্দীকার-১৯৬১), 'অনিরুদ্ধ' (গন্ধর্ব-১৯৬৫), 'শের আফগান' (নান্দীকার-১৯৬৬), 'চিড়িয়াখানার গল্প' (শৌভনিক-১৯৬৮), 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' (শিল্পী যাযাবর-১৯৬৯)। স্থিতির আশ্বাসে ভুলে, নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের নেশায় মধ্যবিত্ত গ্রুপ থিয়েটার জীবন থেকে সরে এসে শিল্পচর্চায় মেতে উঠল। কিন্তু পঞ্চাশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আপাতস্থিতি ষাটের দশকের গোড়াতেই ভারত-চীন সংঘর্ষের (১৯৬২) ফলে প্রচণ্ড ধাক্কা ফেল। জাতীয় জীবনের অস্থিরতার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং অনিশ্চয়তা তৈরি হল। ফলস্বরূপ ১৯৬৪-তে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে ভারতীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হল। ১৯৬৫-তে শুরু হল পাক-ভারত যুদ্ধ, ৬৬-তে সারা বাঙলায় নেমে এল দুর্ভিক্ষের ছায়া, সারা দেশ জুড়ে তখন খাদ্যাভাব আর শিল্পসংকট। অনেকের আশার ওপর ভর করে ১৯৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হল, কিন্তু তা ভাঙতেও বেশি সময় লাগল না—'৬৮-তে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হল এই প্রদেশে। ১৯৬৯-এ একদিকে কংগ্রেসের ভাঙন, অন্যদিকে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক ভারসাম্যের অভাবকে প্রকট করে তুলল। ইতিমধ্যে ১৯৬৮-৬৯-এ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি টুকরো হয়ে গঠিত হয়েছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)।

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ওলটপালটের এই ছবি বাঙলা নাটক কখনো আংশিকভাবে ধরতে পারলেও দ্রুত-বদলে-যাওয়া সময় আর জটিল থেকে জটিলতর হয়ে আসা রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ বা মূল্যায়ন কোনোটাই সম্ভব হল না। পরিবেশের অস্থিরতা-রূপায়ণ প্রসঙ্গে যে কতিপয় প্রযোজনার নাম করা যায়, তা হল: 'বিসর্জন' (বহুরূপী-১৯৬১), 'তাসের দেশ' (শৌভনিক-১৯৬৩), অচলায়তন' (রূপকার-১৯৬৬), 'কল্লোল' (এল. টি. জি.-১৯৬৭), 'তীর' (এল. টি. জি.-১৯৬৭), 'বর্বর বাঁশী' (বহুরূপী-১৯৬৯)। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এল. টি. জি. মঞ্চস্থ করল 'অজেয় ভিয়েতনাম' (১৯৬৭) ও 'মানুষের অধিকারে' (১৯৬৮)। নান্দীকারের 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' (১৯৬৪) বা 'তিন পয়সার পালা'তে (১৯৫৯) সাধারণভাবে রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ করা গেলেও (যেমন অন্য দলের সমসাময়িক প্রযোজনাতে) সে সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার নেই, কারণ এ ধরনের সচেতনতা বিগত দু দশকের উত্তরাধিকার, পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নতুন কোনো ছবি তুলে ধরতে পারে নি। যদিও আগেই বহুরূপীর 'রাজা অয়দিপাউস' (১৯৬৪) ও 'রাজা'কে (১৯৬৪) বৃহত্তম পটভূমিকায় মানুষের নাটক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তবু এখানে উল্লেখ্য যে এই দুটি প্রযোজনা

তাঁরা একসঙ্গে 'দুটি অন্ধকারের নাটক' শিরোনামে মঞ্চস্থ করতেন। প্রশ্ন জাগে, জাতীয় জীবনের সার্বিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে এই অন্ধকার কি শুধুই মানুষ-এর আত্মিক জীবনে আলো-অন্ধকারের ভিন্নধর্মী ভূমিকার কথা বলল, নাকি সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের সমকালীন দুর্যোগকে চিহ্নিত করল? 'বহুরূপী'র পূর্ববর্তী প্রযোজনার ঐতিহ্য মনে রাখলে বোঝা যাবে, এই দুটি নাটকে তাঁরা একই সঙ্গে দেশকালোত্তীর্ণ মানবিক পরিস্থিতি এবং একেবারে সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার কথা বললেন।

১৯৬৭-তে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি জেলায় যে কৃষক-আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ১৯৬৯-এ সে আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগল কলকাতায়। কিন্তু এ শহরে এই রাজনৈতিক আন্দোলন মূলত যুবসম্প্রদায়ের একাংশকে উদ্বুদ্ধ করল, তেমন ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারল না সমাজের সর্বস্তরে। মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে ছাত্র-যুব-নেতা তৈরি হলেও শহুরে মধ্যবিত্ত যতটা পারল গা বাঁচিয়ে রইল। ১৯৭০-৭১-এর মধ্যে নকশাল আন্দোলনে অনেকখানিকেই দমন করা সম্ভব হল। সঙ্গে-সঙ্গে ১৯৬৮-তে তৈরি হওয়া কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-তেও ভাঙন ধরল। ১৯৭০-৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর যুদ্ধকালীন উদ্বাস্তু আগমন পশ্চিমবাঙলার রাজনীতি আর অর্থনীতির ওপর একটা ছাপ ফেলল। এই দশকের প্রথম ভাগে ইন্দিরা কংগ্রেস প্রায় সব রাজ্যেই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু ১৯৭৪-এ ইন্দিরা রাজত্বের বিরুদ্ধে শুরু হল দেশব্যাপী আন্দোলন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে। ১৯৭৫-এ এই বিক্ষোভ আর আন্দোলনের অবদমন ঘটাতে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হল। এর পরবর্তী দু বছর অত্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটিয়েছে দেশের মানুষ। ১৯৭৭-এর সাধারণ নির্বাচনে তারা কেন্দ্রে জনতা পার্টিকে আর রাজ্যে বামফ্রন্টকে নির্বাচিত করল। কিন্তু এই

দশকের শেষ বছরে জনতা সরকার ভেঙে গিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাকে আবার অনিশ্চিত করে তুলল। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কিন্তু খানিকটা স্থিতিশীল হতে শুরু করল বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকেই। বিশেষ করে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এক ধরনের আশা আর বিশ্বাস খুঁজে পেল বামফ্রন্ট রাজত্বে।

ষাট দশকের অনিশ্চয়তা নিয়েই সত্তরের জন্ম এবং অভিবাহন। কিন্তু সত্তরের জন্মলগ্নে এমন একটি বিস্ফোরক মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিমবাঙলায়, ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে যা প্রায় ১৯৪৭-৪৮-এর সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় শীর্ষলগ্নে বাঙলা শিল্পে কিংবা সাহিত্যে বা নাটকে কোনো নতুন প্লাবন এল না, কারণ মুহূর্তটি তার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল, সমস্ত মানুষকে জড়িয়ে ইতিহাস হয়ে উঠতে পারল না। যে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সামাজিক আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, এক-দেড় দশকের স্থিতি আর নিরাপত্তার অনুভব কোথাও যেন তাদের চরিত্রভ্রষ্ট করেছিল। তবে এই নিষ্ক্রিয়তার অন্য একটা আর্থ-সামাজিক কারণও ছিল। সময়ের বদলের সঙ্গে-সঙ্গে, অর্থনীতির কাঠামোর বদলের সঙ্গে-সঙ্গে শ্রেণীগুলোর চেহারাও পালটে যাচ্ছিল। সমস্ত সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক উচ্চাশার যে বীজ ছড়িয়ে গিয়েছিল তারই ফলে সর্বত্র একটা ঊর্ধ্বমুখী স্রোত লক্ষ করা গেল। (প্রসঙ্গত অবস্থার ক্রমজটিলতা সত্ত্বেও ইদানীংকালে শ্রেণী থেকে শ্রেণী ঊর্ধ্বারোহণ অব্যাহত আছে।) নিম্নবিত্ত স্তর থেকে যে মানুষ মধ্যবিত্ত সমাজে উঠে আসছে তার মূল্যবোধ বা চরিত্র মধ্যবিত্তের নয়, আবার যে মধ্যবিত্ত তার ওপরের স্তরে উঠতে চাইছে সে আগে থেকেই উচ্চবিত্তের মূল্যবোধ আর চরিত্র আহরণের চেষ্টা করছে। অতএব মধ্যবর্তী এই শ্রেণীর অবয়বে আর চরিত্রে এক ধরনের অস্থায়িত্ব দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকের

মাঝামাঝি থেকে শুরু করে সত্তরের দশকে সমাজের চেহারাটা খুব দ্রুত বদলে গেছে। ইতিহাস আর সময়ের যে গতি স্বাধীনতার আগে বা অব্যবহিত পরে ছিল, তা আন্তর্জাতিক ঘটনার চাপে এবং ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ জটিলতার কারণে ক্রমশই বেড়ে গেছে।

মধ্যবিত্তের থিয়েটার মধ্যবিত্তের চরিত্র আর মূল্যবোধকে নিজের সাংগঠনিক কাঠামোয় এবং শৈল্পিক চরিত্রে এর আগেই আত্মসাৎ করেছে। ষাটের দশকের শেষ থেকে গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যে যে ভাঙন শুরু হয়েছে, তার প্রধান কারণ এর মধ্যবিত্ত চরিত্র। সত্তরের দশকে সারা পশ্চিমবাঙলা জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য গ্রুপ গজিয়ে ওঠা সত্ত্বেও সমাস্তরালভাবে নাট্যবোধ বা নাট্যচর্চার কোনও অগ্রগতি হয় নি। এর মূল কারণ উদ্দেশ্য আর স্বারুপ্যের বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রের অভাব, যা গোড়ার দলগুলির ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট। অন্যদিকে, শিল্পমাধ্যম হিসেব সময় আর সমাজের অস্থিরতার বিশ্লেষণ বা সমালোচনা করতে পারল না এই থিয়েটার। অথচ, এমনই একটা দায় নিয়ে সে যাত্রা শুরু করেছিল এবং আরম্ভের লগ্নে এই দায়িত্ব সে পালনও করেছিল। সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির অভাবের ফলে সত্তরের বাঙলা নাটক তাৎক্ষণিক ও আপতিক সমস্যার বিশ্লেষণকে ঐতিহাসিক চেতনা বলে ভুল করল।

ষাটের দশকে প্রযোজিত এল. টি. জি.-র 'তীর' (১৯৬৭)-এর কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক চিন্তাকে কেন্দ্র করে এ নাটকের রূপায়ণ। সমসাময়িক রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকে সত্তর দশকের অর্থবহ প্রযোজনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হে সময় উত্তাল সময়' (নান্দীকার-১৯৭০), টিনের তলোয়ার' (পি. এল. টি.-১৯৭১), 'রাজরক্ত' (থিয়েটার ওয়ার্কশপ-১৯৭১), 'মারীচসংবাদ' (চেতনা-১৯৭৩), 'দুঃস্বপ্নের নগরী' (পি. এল. টি.-১৯৭৪), 'স্পার্টাকাস' (চেতনা-১৯৭৪), 'আন্তিগোনে' (নান্দীকার-১৯৭৫), 'তিতুমীর' (পি. এল. টি.-১৯৭৮), 'মহাকালীর বাচ্চা' (থিয়েটার ওয়ার্কশপ-১৯৭৮), 'প্রস্তুতি' (থিয়েটার কমিউন-১৯৭৯)। দ্রুত সময়ের পরিবর্তনের জন্য মূল্যবোধের যে অবক্ষয় ঘটছিল সমাজে তাকেও স্পর্শ করল কিছু নাট্য প্রযোজনা: 'ভালোমানুষ' (নান্দীকার-১৯৭৪), 'ভালোমানুষের পালা' (চেতনা-১৯৭৪), 'জগন্নাথ' (চেতনা-১৯৭৭), 'অমিত্রাক্ষর' (শূদ্রক-১৯৭৮), 'পাপপুণ্য' (নান্দীমুখ-১৯৭৮), কিন্তু সামগ্রিকভাবে মধ্যবিত্ত মানুষের—যারা গ্রুপ থিয়েটারের দর্শক—তাদের পরিপার্শ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক জটিলতাকে থিয়েটার ধরতে পারল কই? এই ব্যর্থতা কি তার অস্তিত্বের অবক্ষয়ের মূল কারণ নয়, তার বাহ্যিক প্রকাশ তার বিবিধ সমস্যাবলী?

কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের সংকট আর ইতিহাসের শেষ পর্যায়ে পৌঁছনোর আগে এই আন্দোলনের আর-এক উপাঙ্গের কথা বলা দরকার। শ্রীবাদল সরকার, যাঁর প্রথম এবং প্রধান খ্যাতি নাট্যকার হিসেবে, ১৯৬৭-তে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন, নাম দেন 'শতাব্দী'। প্রথম যুগের প্রযোজনাগুলোর তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না, এইটুকু ছাড়া যে মূলত মৌলিক নাটকই তাঁদের উপজীব্য ছিল। বাদল সরকারের এই পর্যায়ের নাটকে অস্তিত্ববাদের ছোঁওয়া থাকত। ১৯৭২ তিনি 'অঙ্গনমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করেন যার মূল আদর্শ ছিল এটোস্টি-অনুপ্রাণিত থিয়েটার। পরে এই 'অঙ্গনমঞ্চে'র নাটকগুলিই 'থার্ড থিয়েটার' রূপে পরিচিত হয়। থার্ড থিয়েটার'-এর প্রধান উদ্দেশ্য মঞ্চের গণ্ডি ভেঙে দর্শকদের নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা, বৃহত্তর জনগণের কাছে পৌঁছনো, মঞ্চের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কলাকৌশল বাদ দিয়ে অভিনেতাদের শরীর ব্যবহার করে প্রযোজনা গড়ে তোলা। 'স্পার্টাকাস', 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'মিছিল', 'ভোমা' ও 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' এঁদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। বিদেশ থেকে আমদানি করা 'থার্ড

থিয়েটার' সত্তর দশকের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দেশের মানুষকে কতটা বুঝতে বা তার কাছে পৌঁছতে পেরেছে সে সম্বন্ধে সংশয় আর প্রশ্ন দুই-ই আছে, তবে এই প্রবন্ধের পরিসরে তা আলোচ্য নয়।

১৯৮০ সালেই ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কংগ্রেস-রাজ নিয়ে আবার পূর্ণ প্রতাপে ফিরে এলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার কায়েম রইল। সরকারি গদিতে থাকতে থাকতে একটি রাজনৈতিক দলের বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিবর্তন হতে বাধ্য। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখা দরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই সরকার নানাভাবে থিয়েটারকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন, সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে এর প্রতিদানে থিয়েটারও বামফ্রন্ট সরকারকে যথোচিত সাহায্য করছে। ইতিহাসের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। সারা ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে একটা জরুরি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে এই দশকের শুরু থেকে—পানজাব, আসাম বা দার্জিলিঙ-এর বিক্ষোভ যার উদাহরণ—বিভেদকামী প্রাদেশিক শক্তির উত্থান। অবশ্য ১৯৮৪-তে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর এবং রাজীব সরকার আসার পর থেকে নানারকম চুক্তি ইত্যাদি করে এদের শান্ত করার চেষ্টা চলেছে, কিন্তু রাজনীতিতেই তো শুধু নয়, জাতীয় চরিত্রে এর বীজ পোঁতা হয়ে গেছে—একে উৎপাটিত করা শক্ত। এদিকে রাজীব সরকারের সঙ্গে-সঙ্গে আমরা প্রবল বেগে একবিংশ শতাব্দীর দিকে এগিয়ে চলেছি—টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন, অন্যান্য প্রচার-মাধ্যম, ভিডিও, ড্রাগ, সংস্কৃতি ইত্যাদিতে সাধারণ মধ্যবিত্ত গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। নিজের চোখ, মনন বা বুদ্ধি ব্যবহার করার ক্ষমতা বা অবসর কোথায় তার? প্রযুক্তিগত প্রগতির সাংঘাতিক স্রোতে ভেসে যেতে-যেতে নিজের অস্তিত্বের বাইরে সে আর কিছু চিন্তা করতে পারছে না।

আদর্শভ্রষ্ট, চরিত্রভ্রষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজের মতোই কলকাতার থিয়েটার শহরের মাটি কামড়ে টিঁকে থাকার লড়াই লড়ছে। সামাজিক পরিস্থিতির গভীর থেকে কোনও প্রেরণা না খুঁজে পেয়ে আন্তরিক নাট্য প্রচেষ্টার বদলে অতীতের জনপ্রিয়তা ভাঙিয়ে, দর্শকের মন জুগিয়ে, ব্যবহৃত বিষয় আর চোখ-ধাঁধানো আঙ্গিক[৩] কাজে লাগিয়ে এ থিয়েটার এখনও বেঁচে আছে, সমস্ত সমাজদেহে চিন্তা আর মননের যে আবদ্ধতা, বাস্তবদৃষ্টি ও মূল্যবোধের অভাব, সহজ প্রতিষ্ঠা আর অর্থের জন্য প্রতিযোগিতা—সবই গ্রুপ থিয়েটারের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে। শিল্পীর প্রস্তুতির সাধনার বদলে লোকচক্ষুর সামনে আসার আকাঙ্ক্ষাই বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রযোজনার উৎকর্ষ নয়, অভিনয়রজনীর সংখ্যা পরিচালক ও কর্মীদের সন্তুষ্ট রাখে, দলগুলির সংযোগসূত্র এখন সহযোদ্ধার বন্ধুত্ব নয়, প্রতিযোগীর ক্ষুদ্র ঈর্ষা। 'গ্রুপ'-গুলোর মধ্যে ক্রমাগত ভাঙন বহু নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম দিলেও তুলনায় গুণগত কোনও উৎকর্ষসাধন করে নি। স্ববিরোধ আর সমস্যায় বিজড়িত আশির দশকের গ্রুপ থিয়েটার নিজের বা সময়ের অসুখকে বুঝতে বা রূপায়িত করতে পারছে না।

গত পাঁচ-ছয় বছরের নাট্য-প্রযোজনাগুলো পর্যালোচনা করলে কয়েকটা প্রধান প্রবনতা দেখা যাবে। প্রথম, প্রযোজনার আঙ্গিক নিয়ে যাবতীয় অন্তঃসারশূন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা; দ্বিতীয়, প্রগতিবাদের ভেকে পুরনো বস্তা-পচা রাজনীতির পরিবেশন; তৃতীয়, পুরাণ বা অন্যতর পরিপ্রেক্ষিতের দূরত্বে সময় আর পারিপার্শ্বিকের মূল্যায়ন; চতুর্থ, সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার অতিসরলীকৃত বিশ্লেষণ; পঞ্চম, সুস্থ নাটকের নামে দর্শকের মধ্যে নিম্নরুচির প্রবর্তন। প্রথম প্রবণতার নাটকগুলি বিশুদ্ধ শিল্পচর্চার কাজে লাগলেও আমাদের জটিল পরিবেশকে বুঝতে কতটা সাহায্য করে বলা শক্ত। 'থিয়েটার কমিউনে'র 'জুলিয়স সীজারের শেষ সাত দিন', থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'বিসর্জন'-এর নতুন সংস্করণ বা নান্দীকারের 'ব্যতিক্রম' ও 'মাননীয় বিচারকমণ্ডলী' এইজাতীয় প্রযোজনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রযোজনাগুলো পুরনো পুঁজি ভাঙানোর মতো করে রাজনৈতিক সচেতনতা ভাঙিয়ে বেঁচে থাকতে চাইছে, দর্শকের মন টানার জন্য কৌতুক বা ব্যঙ্গের মিশেল দিয়ে, সমকালীন রাজনীতির বহুস্তর জটিলতাকে স্পর্শ করবার কোনো চেষ্টা নেই সেখানে। সায়কের 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' বা সুন্দরমের 'নৈশভোজ' এই ধরনের নাট্যপ্রযোজনা। তৃতীয় প্রবণতার নাট্যপ্রচেষ্টাগুলো সংখ্যায় বেশি হলেও সবক্ষেত্রে সমান সার্থক নয়, যদিও উদ্দেশ্য হয়তো সৎ, বহুরূপীর 'ধর্মাধর্ম', নান্দীকারের 'হননমেরু', পি. এল. টি.-র 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', থিয়েটার কমিউনের 'মহামাসতৈল', থিয়েটার সেন্টারের 'ভাসান', সংস্তবের 'অভিমুখ'-এর মধ্যে পূর্ব-উল্লিখিত উদ্দেশ্য কাজ করলেও শেষপর্যন্ত তা বিভ্রান্ত। আবার এই প্রবণতার সার্থক প্রযোজনার মধ্যে চার্বাক-এর 'উত্তরপুরুষ'. চেনামুখ-এর 'আত্মশুদ্ধি' বা নান্দী মুখের 'তেত্রিশতম জন্মদিবস'-এর নাম করা যায়। তবে এই-জাতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ পঞ্চম বৈদিক-এর 'নাথবতী অনাথবৎ'। দ্রৌপদী চরিত্রের রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে নেতৃহীন, অবহেলিত, প্রবঞ্চিত স্বদেশ-ভূমির কথাই বলা হয়েছে। বাঙলা নাটকের হতাশা-পূর্ণ প্রেক্ষিতে 'নাথবতী অনাথবৎ' তার নাট্যবস্তুর গভীরতা ও লোকনাট্যের সার্থক আত্মীকরণ নিয়ে দুর্লভ আলোর নিশানা। বহুরূপীর সাম্প্রতিকতম নাটক 'মালিনী'তে সময় সম্পর্কে ক্ষীণ ইঙ্গিত থাকলেও প্রযোজনার অতি-অলংকরণের চাপে সেটুকুও বোধ-গ্রাহ্য হয় না। চতুর্থ ধারার প্রযোজনার উদাহরণ হিসেবে বহুরূপীর 'রাজদর্শন' বা ভূমিকার 'সূর্যাস্ত' উল্লেখ করা যায়। পঞ্চম প্রবণতা দেখা যায় থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' বা অন্য থিয়েটারের 'হচ্ছেটা কী' জাতীয় নাট্যপ্রযোজনায়। গ্রুপ থিয়েটারের উদ্দেশ্য বা দায়িত্ব পালনের বদলে এতদিন ধরে তিল-তিল করে তৈরি করা সুস্থ থিয়েটারের দর্শকের চরিত্র নষ্ট করতেই আগ্রহী মনে হয় এই প্রযোজনাগুলোকে। অবশ্য এ ছাড়াও বাঙলা মঞ্চে এমন প্রযোজনা আছে যা সংভাবে সমকালীন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেও পথভ্রষ্ট হয়েছে অথবা প্রায়োগিক উৎকর্ষের অভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছুতে পারে নি। উদাহরণস্বরূপ, গাঙ্গারের 'কুমার-সম্ভব', চেতনার 'রোপণ' কিংবা থিয়েটার ওয়ার্কশপের ইদানীংকার প্রযোজনা 'বেলা-অবেলার গল্প'-এর নাম করা যায়। শূদ্রক-এর 'অসমাপ্ত' এইজাতীয় নাট্য-প্রচেষ্টার নিকৃষ্ট উদাহরণ—কারণ সমস্ত নাটকটাই খুব অপরিষ্কার আর বিচ্ছিন্ন চিন্তায় ভরতি আশির দশকে এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ দুটি প্রযোজনার নাম করতে হলে "নাথবতী অনাথবৎ"-এর সঙ্গে সঙ্গে চেনামুখের 'রানীকাহিনী'র কথাও মনে আসে। 'রানীকাহিনী' সম্পূর্ণ ভিন্ন নিরিখে দেখার নাটক। তেমন প্রত্যক্ষ কোনো সমস্যা এতে না আলোচনা করা হলেও মানবিক আবেদনে এ প্রযোজনাটি ঐশ্বর্যবান। প্রযোগের দিক থেকেও এটি নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট প্রযোজনা।[৪]

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকেই গ্রুপ থিয়েটারের সমস্যাগুলো দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠছিল। দর্শকসংখ্যার হ্রাস, নাট্যকারের অভাব, অর্থাভাব ইত্যাকার সমস্যার সম্মুখীন হয়ে গ্রুপ থিয়েটারের কর্ণধারেরা দু-একটা সমাধান ভেবেছেন। যেমন, নাটককে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা, বা গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে দর্শক তৈরি করা, কিংবা গ্রুপ থিয়েটারকে পুরোপুরি পেশাদারি-রূপ দেওয়া। এসবে বিশেষ কিছু ফল যে হয় নি দেখাই যাচ্ছে। আবার একদল মনে করছেন থিয়েটার গোষ্ঠীগুলোর সংঘবদ্ধ হওয়ার মধ্যেই পুনরুজ্জীবনের রহস্য লুকোনো আছে। সত্তরের দশকের গোড়ায় বাঙলা নাটকের নাটমঞ্চ তৈরির সদুদ্দেশ্যে শ্রীশম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে কিছু অগ্রণী নাট্যদল একজোট হয়ে কয়েকটি প্রযোজনা করেছিলেন। কিন্তু কয়েকটি ভালো নাটকের মঞ্চায়ন (যেমন 'মুদ্রারাক্ষস' বা 'তুঘলক') ছাড়া গ্রুপ

থিয়েটারের আর বিশেষ কোনও লাভ হয় নি। শোনা যায় সাধারণ মানুষের আন্তরিক সাহায্য সত্ত্বেও কেবল একটি উপযুক্ত জমির অভাবে এই সৎ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রতিককালে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে নাট্যগোষ্ঠীগুলোর সংঘবদ্ধ হবার দুটো প্রচেষ্টা—'গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ও 'কলকাতা নাট্যকেন্দ্র'—ব্যর্থ হওয়াতে এজাতীয় সমাধান সম্পর্কে অনেকেই আশা হারিয়েছেন। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বাঙলা থিয়েটার যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জয়যাত্রা শুরু করেছিল, বাঙলা নাটকে সে আদর্শ বেঁচে থাকবেই, তা যেমন চেহারায় হোক না কেন।

যদিও একথা সত্যি যে সাধারণভাবে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে যে চেতনা আর বোধের অভাব দেখা দিয়েছে তারই প্রত্যক্ষ ফল গ্রুপ থিয়েটারের এই স্বধর্মচ্যুতি, তবু জীবনের প্রতি শিল্পের, বিশেষত নাটকের একটা বাড়তি দায় থাকে। নাটক যদি তার এই মৌল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হয়, যদি তা নিজের সমাজ ও সময়কে বোঝার সচেতন ও আন্তরিক প্রয়াস করে যায়, যদি সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এক সুস্থতার পরিমণ্ডল তৈরির চেষ্টা করে তবে নাটক নিজেই শুধু বাঁচবে না, পারিপার্শ্বিককেও নতুন জীবনের মন্ত্র দেবে। যখন বাঙলা থিয়েটার তার যথার্থ ভূমিকা পালন করবে সেই মহাক্ষণ সমাসন্ন—এই আশা নিয়ে প্রতীক্ষায় আছি।

পাদটীকা

১. বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই নতুন স্রোত যে কিভাবে 'গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন' রূপে চিহ্নিত হল তার কোনো হদিশ পাওয়া শক্ত। কেউ কেউ মনে করেন আমেরিকায় এই শতাব্দীর তিরিশের দশকে অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার সময়ে দেশের মানুষকে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন করতে এলিয়া কাজান, মার্লন ব্রাণ্ডো, হ্যারল্ড ক্লারম্যান প্রমুখ যে পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী গঠন করেন তারই 'গ্রুপ থিয়েটার' নামের সঙ্গে বাঙলার এই নাট্যপ্রয়াসের হয়তো কোনো যোগ আছে। আবার গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় তিরিশের দশকের শেষে লখনৌ-এর প্রগতি লেখক সংঘের শ্রীমামুদ জাফর এবং উর্দু লেখিকা শ্রীমতী রসিদা জাহান একটি নাট্যদল তৈরি করেন যার নাম দেন 'গ্রুপ থিয়েটার'। আবার এমনও হতে পারে পূর্ববর্তী ব্যবসায়িক থিয়েটারে যে ব্যক্তিত্বপ্রধান নাটক ও সংগঠন দেখা গেছে তারই বিরুদ্ধ নাট্যপ্রচেষ্টা হিসাবে এর নাম দেওয়া হল 'গ্রুপ থিয়েটার'—সব নাট্যকর্মী তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতাটুকু সমভাবে ব্যবহার করে গড়ে তুলবেন একটি গোষ্ঠী, একটি প্রযোজনা। এই তৃতীয় ব্যাখ্যাটিতে অনেকেই আপত্তি করবেন কারণ গ্রুপ থিয়েটার শেষ পর্যন্ত এ আদর্শকে হয়তো রক্ষা করতে পারে নি। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাসকে 'আন্দোলন' বলে চিহ্নিত করতে অনেকে আপত্তি করেন। তাঁদের মতে এই স্রোতে আন্দোলনের আবেগ যতো ছিল শৃঙ্খলা বা পরিকল্পনা ততোটা নয়। তাই অচিরেই তা বিলুপ্ত হতে বসেছে। স্বীকার করতেই হবে যে কথাটা আংশিকভাবে হলেও, সত্যি। যাই হোক, এটা ঠিক যে গণনাট্য আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা নাট্যজগতে ব্যবসায়িক থিয়েটারের পাশাপাশি যে গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল নাট্যধারাটি তৈরি হল তা আজ ভারতবর্ষের নাট্যজগতের সর্বস্তরেই "গ্রুপ থিয়েটার" হিসেবে চিহ্নিত।

২. সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ না করলেও সাধারণভাবে রাজনৈতিক সচেতনতার সার্থক রূপায়ণ এ সময়ের দু-একটি প্রযোজনায় দেখা যায়—"চাকভাঙা মধু" (থিয়েটার ওয়ার্কশপ-১৯৬৭?), "দানসাগর" (থিয়েটার কমিউন-১৯৭৬), সাজানো বাগান (সুন্দরম-১৯৭৭)।

৩. এই আলোচনায় প্রযোজনার আঙ্গিকের বিবর্তনের কথা তেমন আলাদা করে কিছু বলা হয় নি, কারণ গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাস রচনা এর লক্ষ্য নয়। বরং গ্রুপ থিয়েটারের সমস্যা ও সংকটের সঙ্গে দেশের সামাজিক ও আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসের কী সম্পর্ক, সেটাই ছিল আলোচ্য। তবু এখানে দু-একটা কথা বলে নেওয়া কর্তব্য। গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম যুগে গণনাট্যের প্রযোজনার ছাঁচে নাটকের দৃশ্যপটের আয়োজন ছিল সামান্য। আলোর সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার নাটককে তার বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দিতে সাহায্য করত। তবে এই ধারার পাশে-পাশেই আর-একটি ধারা লক্ষ করা যায়—মূলত শ্রীউৎপল দত্ত-পরিচালিত এল. টি. জি.-'র প্রযোজনায়—মঞ্চস্থাপত্য ও আলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার—যাতে "কল্লোল" নাটকে মঞ্চের ওপর জাহাজের দিকবদল বা "অঙ্গার" নাটকে কয়লাখনিতে জলপ্লাবন সবকিছু ছাপিয়ে দর্শকের স্মৃতিতে গেঁথে থাকে। কলকাতার মঞ্চে ব্রেশট-এর আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে আঙ্গিকগত দিক সম্বন্ধে একটা নতুন সচেতনতা এল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এটা একটা অতি-সচেতনতায় পর্যবসিত হল। হয়তো এর বীজ ছিল তার আগের পর্বের কিমিতিবাদী ও অস্তিত্ববাদী নাট্যপ্রযোজনার মধ্যে। ইদানীং মঞ্চ-সাজানো ও আলোর ব্যবহারে চমকে দেওয়া বা চোখ-ধাঁধানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। হয় প্রযোজনার আঙ্গিকে সম্পূর্ণ নতুন কোনো উপাদান ঢুকিয়ে নয়তো মঞ্চ ও আলোকের অতি-ব্যবহার করে মন-কাড়ার চেষ্টা চলেছে। অন্তর যখন শূন্য হয়ে আসে তখন বুঝি এমনি করেই বাইরের রূপ দিয়ে চোখ ভোলাতে হয়।

৪. এই প্রবন্ধটি মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক নাট্যগোষ্ঠীগুলি নিয়ে লিখিত, মফস্বলের কয়েকটি গ্রুপ এখন অত্যন্ত পরিণত প্রযোজনা করেন। তাঁদের মধ্যে বালুরঘাটের 'ত্রিতীর্থ' সংস্থার প্রযোজনাগুলি ("জল", "দেবাংশী") কলকাতার গ্রুপগুলোর কাছে নজির সৃষ্টি করতে পারে।

এ ছাড়াও কলকাতা গ্রুপ থিয়েটার ইতিহাসের এই চল্লিশ বছরে আমার জানার বাইরে এমন প্রযোজনা হয়ে থাকতে পারে যা গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যাদর্শের মৌল দাবি পূরণ করেছে।

৫. এই প্রবন্ধটি লেখার সময়ে কয়েকটি বই এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধের সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। তারই একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল :

বই :

Mukherjee, Sushil Kumar. *The Story of Calcutta Theatres : 1753-1980*. Calcutta : K. P. Bagchi & Company, 1982.

Pradhan, Sudhi. *Marxist Cultural Movement in India : Chronicles and Documents* Vol. I Calcutta : Publisher Santi Pradhan, 1st. ed. 1979.

Pradhan, Sudhi. *Marxist Cultural Movement in India : Chronicles and Documents* Vol. II Calcutta : Navana, 1982.

রাহা, কিরণময়, **বাংলা থিয়েটার** বঙ্গানুবাদ : কুমার রায়, নয়াদিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৪

রায়চৌধুরী, সুবীর সম্পাদিত **বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার**, কলকাতা : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২

পত্র-পত্রিকা : প্রবন্ধ

চক্রবর্তী, বিভাস "গ্রুপ থিয়েটারে গ্রুপ" **দেশ** ৫৩ বর্ষ ৪০ সংখ্যা (৯ অগস্ট '৮৬) পৃ. ৯৯-১০১

বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ "পেশাদার লোক ছাড়া অন্যেরা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নাট্য আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে না" **শুধু থিয়েটার** ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা (ডিসেম্বর-জানুয়ারি '৮৪) পৃ. ৬ (পুনর্-মুদ্রণ : থিয়েটার ওয়ার্কশপ স্মারক সংকলন দ্বাদশ বর্ষ থেকে)

বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ "দল ভাঙা বিষয়ে" **থিয়েটার বুলেটিন** (জুলাই-অগস্ট ১৯৭৯) পৃ. ১-৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ "গণ আন্দোলন ও বাংলা থিয়েটার", **থিয়েটার কমিউন** : ৭২-৭৯ (১৯৭৯)

বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন "যাদুদণ্ডের স্বপ্ন" **প্রয়াস স্মরণিকা**

মুখোপাধ্যায়, অরুণ "ভেতর থেকে দেখা" **থিয়েটার বুলেটিন** (এপ্রিল-জুন ১৯৭৯) পৃ. ১-৫

মুখোপাধ্যায়, অরুণ "পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক থিয়েটার গড়ে উঠেছে কি?" **নান্দীকার নাট্যোৎসব সংখ্যা** (১৯৭৯)

মুখোপাধ্যায়, অরুণ "গ্রুপ থিয়েটারের বর্তমান পর্যায় অথবা সংকট" **প্রয়াস স্মরণিকা**

মুখোপাধ্যায়, প্রিতম "কলকাতা ও গ্রুপ থিয়েটার" **আজকাল রবিবাসর** (২৮ অগস্ট, ১৯৮৩) পৃ. ৯

সাহা, নৃপেন্দ্র সম্পাদিত **গ্রুপ থিয়েটার** তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (১৯৮০) পৃ. ১৭-১২৩ (গ্রুপ থিয়েটার সেমিনার ১৯৮০)

Mukherjee, Ananya "Charisma of the Epics *The Telegraph* (February 18, 1984) Pg. 8

এছাড়া 'দৃশ্যকাব্য' আয়োজিত প্রসেনিয়াম-নন্-প্রসেনিয়াম নাটোৎসব (১৯৮৩?) উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজ মিত্র ও শ্রীনীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার আমাকে সাহায্য করেছে। প্রসঙ্গত, ১৯৮৩ সালে "গ্রুপ থিয়েটারের সংকট" সম্বন্ধে আমি গ্রুপ থিয়েটারের কয়েকজন পরিচালকের সঙ্গে কথা বলি (শ্রীকুমার রায়, শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিভাস চক্রবর্তী, শ্রীদ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসলিল বন্দ্যোপাধ্যায়)। এঁদের মতামতও আমার কাজে লেগেছে। এজন্য আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে পেশাভিত্তিক মধ্যবিত্তশ্রেণী

(১৯০০-১৯৩০)

রশীদ আল ফারুকী

উপন্যাসে মানবজাতির এমন এক অংশের চিন্তাচেতনা প্রতিফলিত—যাঁরা আধুনিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী, এবং এই বিশ্বাসকে সমাজের সর্বস্তরে চারিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপর। এ কারণে মানুষের ভেতর এই চেতনার উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত উপন্যাসশিল্পের আবির্ভাব ঘটে নি। এই চেতনা প্রধানত এমন একটি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে স্ফূর্তি লাভ করেছে, যা মানুষের ভেতর মানুষের প্রভেদ স্বীকার করে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রভেদ যত প্রবল হোক না কেন, উপলব্ধির ক্ষেত্রে তা প্রায়ই পরস্পরের কাছাকাছি। মানুষ যেদিন তার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে একই কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছেছে, একমাত্র সেদিনই তার পক্ষে আপন সত্তাকে সমুন্নত করা সম্ভব হয়েছে। এই উপলব্ধি একদিকে মানুষকে আত্মসচেতন করেছে, অন্যদিকে প্রেরণা জুগিয়েছে আত্মনির্ভরতা অর্জনে। এই চেতনা এবং নির্ভরতাই শেষ অবধি মানুষকে একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধ প্রদান করেছে, যার পুরোটাই সমকালীন সমাজবাস্তবের সঙ্গে জড়িত।

বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত সমাজ বলে আমরা যাদের চিহ্নিত করি তারাই এই উপলব্ধিতে স্নাত। এই উপলব্ধি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ফল—যা এ দেশে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। ইংরেজেরা এদেশে নিজেদের শাসনতন্ত্র যথাযথ চালু করার পর যে বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হয় তা হল নিজেদের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করা—যা প্রকারান্তরে এদেশের মানুষের মন এবং মানসিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত করবে। এই উদ্দেশ্যে তারা প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন সংস্কার সাধন করে, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও নিজস্ব ধ্যানধারণা আরোপ করে। কালক্রমে এদেশের একটি অংশ এই পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে সরকারের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হয়। এদের শিক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিল ইংরেজি।

এসব ইংরেজি-শিক্ষিতের দ্বারা সেদিন বঙ্গদেশে যে বিশাল কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাকে যে নামেই বিভূষিত করা হোক না কেন, সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের দান কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজি শিক্ষার ফলে তাঁরা যে সাহিত্য আর সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন, তাই তাঁদের নতুন করে শিল্পচর্চায় উদ্‌বুদ্ধ করে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তার সংস্কৃতিতে দীক্ষিত এই শ্রেণীই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের নির্মাতা। তাঁদের সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা নিরলস ভূমিকা পালন করেন। সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে তাঁরা যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন তা সেযুগের পক্ষে ছিল বিস্ময়কর। এর ফলে আবির্ভূত হয় নতুন-নতুন প্রতিভার, নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে উদ্ভাবিত হয় নতুন-নতুন রূপকল্পের—নাটক, সনেট, গীতিকবিতা, উপন্যাস, ছোটোগল্প ইত্যাদি। এঁরাই ইংরেজের আশীর্বাদপুষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী—

যার বিকাশ সাহিত্যের পক্ষে একটা শুভংকর ফল হিসেবে পরবর্তী কালে নন্দিত হয়েছে। আজ তাঁরাই নতুন করে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তাঁরা নাকি জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কিন্তু তাই বলে যে আদালতে তাঁদের দাঁড় করানো হয়েছে, সেটি গণ-আদালত নয়, বরং সেটিও প্রচুর দুধমাখনে পরিপুষ্ট নধরকান্তিবিশিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদালত। তাঁরাও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে স্নাত।

উপন্যাস উল্লিখিত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে আগত। বাঙলা ভাষায় তার সূচনা হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) থেকে। তার পূর্বে উপন্যাসধর্মী দুয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে থাকলেও তাতে উপন্যাসের লক্ষণ ছিল ক্ষীণ। তবু উপন্যাসের গোত্রভুক্ত এজাতীয় রচনার প্রেরণামূল যে সমাজ এবং শ্রেণীর একটা বিশেষ অবস্থান, তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভবের পেছনেও এমনি একটি সমাজ বা শ্রেণীর অবস্থান বিশেষভাবে কাজ করেছে, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসশিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি এই শ্রেণীর বিকাশ এবং পরিণতির সঙ্গে জড়িত। একথা আজ আর গবেষণার বিষয় না হলেও সেদিন মুসলমানেরা কেন উপন্যাসশিল্পে এগিয়ে আসতে পারেন নি, তাও এই তত্ত্বের সাহায্যে খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

যখন বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী সৃষ্টির আনন্দে সাহিত্যক্ষেত্রে জোয়ার তুলেছিলেন, তখনো মুসলিম মধ্যশ্রেণী গড়ে ওঠে নি। তখনো মুসলমানেরা মূলত দুটো শ্রেণীতেই বিভক্ত ছিলেন—উচ্চবিত্ত এবং দরিদ্র। এঁদের ভেতর ব্যবধান ছিল দুস্তর। এই অবস্থার প্রভাব প্রায় সমাজের সর্বস্তরেই পড়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আধুনিক সাহিত্য। যে সমাজচেতনা এবং রাষ্ট্রচেতনা মুসলমানদের মধ্যযুগে সাহিত্যসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই চেতনার অভাবই তাঁদের আধুনিক-জীবনবিমুখ করে রাখে—যার প্রতিক্রিয়া সাহিত্যেই বেশি অনুভূত হয়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হলেও মুসলমানেরা কিছু দৃষ্টান্ত রেখেছেন বটে, কিন্তু উপন্যাসশিল্পে তাঁদের দান শূন্যের কোঠায়। ১৮৬৫ খ্রী বাঙলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাস রচিত হল। তার বিশ বছর পরে (১৮৮৫) মুসলমানদের ভেতর সর্বাধিক শক্তিশালী লেখক মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রকাশিত হয়। এখান থেকেই মুসলমানদের উপন্যাসরচনার সূত্রপাত। ভাষা এবং চরিত্রচিত্রণে মীর সাহেব এই গ্রন্থে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন সত্য, কিন্তু উপন্যাসের সেই গভীর জীবনবোধ এতে নেই। বরং নানাপ্রকার অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনার স্বচ্ছন্দসমাবেশ গ্রন্থটির রূপকল্প বিচারের ক্ষেত্রে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আরো কয়েকখানা উপন্যাসজাতীয় গ্রন্থ মুসলমানদের দ্বারা রচিত হয়েছে। কিন্তু তার অনেকগুলোই অসার্থক এবং অর্বাচীন। এতে কখনো প্রাধান্য পেয়েছে অলৌকিক জীবন, কখনো বা সমাজবিচ্ছিন্ন এমন এক জীবন—যা কষ্টকল্পনার ফল। তবু বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ধীরে-ধীরে এই রূপকল্পটি মুসলমানদের ভেতর জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে।

উপন্যাসশিল্পের এই জনপ্রিয়তার পেছনে বহুলাংশে কাজ করেছে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ। এই বিকাশ প্রধানত সূচিত হয় প্রথমমহাযুদ্ধপূর্ব সময়ে, পরিণতি লাভ করে যুদ্ধের পর। হিন্দুদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে মুসলমানেরা বেশ পূর্ব থেকেই সাময়িকপত্র প্রকাশের দিকে মনোনিবেশ করেছেন,[1] যা মধ্যবিত্ত মানস বিকাশের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। এই সময় বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে প্রবল বিতর্কের সূচনা হয়। এই বিতর্কের মূলে কাজ করে অভিজাত মুসলমানদের বাঙলাভাষা-বিরোধী ভূমিকা। ফরিদপুরের নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) ১৮৮২ সালে হান্টার শিক্ষা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য প্রদান করতে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, বঙ্গদেশের অভিজাত (আশরাফ) মুসলমানের মাতৃভাষা উরদু এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের (আতরাফ) মাতৃভাষা বাঙলা।[2] সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) একই কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন যে, বাঙালি হিন্দুর কাছে বাঙলার গুরুত্ব যেরকম, বাঙালি মুসলমানের কাছে উরদুর গুরুত্ব ঠিক একই রকম।[3] মাতৃভাষা নিয়ে সেদিনের এই বিরোধ এবং বিতর্ক প্রধানত এসব সদ্য-গজিয়ে-উঠা পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করে। সেদিনের এই বিরোধ এবং বিতর্কে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা ছিল বৈপ্লবিক। কারণ, তাঁদের প্রধানত বিত্তশালী মুসলমানদের মতামত উপেক্ষা করেই এই প্রচারে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। মুসলিমরচিত আদিকালের উপন্যাসগুলোতে বহিরাগত মুসলমানদের প্রতি করুণা আর ঘৃণা প্রকাশ পাওয়ার এও একটা হেতু বলে মনে হয়। কারণ, তাঁরাই বঙ্গদেশের সাধারণ মানুষের ভাষা বর্জন করে অন্য প্রদেশের একটি নতুন ভাষা (উরদু) মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আরবি-ফারসিকে তাঁরা যে স্থানেই প্রতিষ্ঠা করুন না কেন, বাঙলা ভাষার প্রতি তাঁদের অনুরাগ ছিল অবিসংবাদিত।

বাঙলা ভাষা আর সংস্কৃতিকে নিয়ে যখন মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর উন্মেষ ঘটছিল, তখনি বঙ্গদেশে পাটশিল্প জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তার মাধ্যমে নতুন-নতুন পণ্য তৈরির পথ আবিষ্কৃত হয়। বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলের জলবায়ু এবং তার পলিমিশ্রিত মাটি পাটচাষের উপযোগী বলে এই অঞ্চলটি পাটচাষকেন্দ্রে পরিণত হয়—যার বেশির ভাগই মুসলিমপ্রধান। মুসলমানেরা এই পাটকে কেন্দ্র করে ব্যাবসাবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের হাতে কাঁচা পয়সা আসতে থাকে, ফিরে আসে তাঁদের জীবনে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য। এই ব্যাবসাকে কেন্দ্র করে তাঁরা কলকাতায় হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের শিক্ষা-

দীক্ষা এবং চালচলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁদের ভেতর জেগে ওঠে শিক্ষানুরাগ। ফলে পূর্ববঙ্গের এই উঠ ত মধ্যবিত্তশ্রেণী ধীরে-ধীরে কলকাতায় জেঁকে বসেন। অনেকে পাটবেচা টাকায় জমিদারি পর্যন্ত ক্রয় করেন। এঁদের একটা বড়ো অংশ কলকাতা-কেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে বঙ্গভঙ্গের পর্যন্ত বিরোধিতা করেছিলেন।[৪]

দুই

মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসের বিকাশপর্বের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর উত্থানের ইতিহাস। এই উত্থান বিচিত্র ধরনের পেশাকে কেন্দ্র করে আত্ম-প্রকাশ করেছে। এসব উপন্যাসে কর্মচঞ্চল মধ্যবিত্ত-শ্রেণীকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁরা হলেন, (ক) ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণী—যাঁরা সামন্তবাদী আবহের প্র.ত আস্থাশীল, ক্ষয়িষ্ণু এবং পশ্চাদ্‌মুখী ; (খ) ভূমিনির্ভর মধ্য-বিত্তশ্রেণী—যাঁরা সামন্তবাদী ধ্যান-ধারণায় পরিপুষ্ট হয়েও আধুনিক এবং প্রাগ্রসর ; (গ) উঠ.ত মধ্যবিত্তশ্রেণী—যাঁদের মূল পেশা শিক্ষকতা, সরকারি চাকুরি, অথবা ব্যাবসা-বাণিজ্য ; এবং (ঘ) বর্ধিষ্ণু কৃষকসম্প্রদায়।

ক

মুসলমানদের রচিত উপন্যাসে বহু জমিদারের চিত্র রয়েছে। এসব জমিদারের বেশির ভাগই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্গত—সে আর্থিক অবস্থার বিচারে হোক, কি মানসিকতার বিচারে। এসব উপন্যাসে এক-আধ ঘর বিত্তশালী জমিদারের সন্ধান পাওয়া গেলেও, তাদের বিত্তবৈভবের চিত্র তেমন ফুটে ওঠে নি। এর কারণ পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞতাও হতে পারে, আবার জমিদারশ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে উপলব্ধির অভাবও হতে পারে। একথা এজন্যে বলা যায় যে, এজাতীয় চরিত্র-অঙ্কনকারীদের ভেতর ব.রশালের উলামিয়া গ্রামের জমিদার মুহম্মদ নুরল হক চৌধুরীও (১৮৮৪-১৯৮০) রয়েছেন। তিনি একাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু এসব উপন্যাসে বিধৃত নরনারীও মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত। এসব উপন্যাসের পাত্রপাত্রাদের জী.বকার মূল অবলম্বন জমিদারি আর জোতদারি হলেও কালের গ্রাস থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তাঁদের নানাপ্রকার উপজীবিকা গ্রহণ করতে হয়েছে—যেগুলো তাঁদের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ভেতর প্রধান হল ধর্মব্যবসায় এবং বংশমর্যাদাহীন অর্থশালী ব্যক্তিবর্গের নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কৌলীন্য বি.ক্র। এঁরা পারিবারিক জীবনে যেমন রক্ষণ-শীল, তেমনি সামাজিক জীবনে পশ্চাদ্‌মুখী। অতএব শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা অনগ্রসর। যেসব মুসলমান ঔপন্যাসিক এই শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের ভেতর কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৭), মুহম্মদ নুরল হক চৌধুরী, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও শফীউদ্দিন আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। শফীউদ্দিন আহমদের 'সৈয়দ সাহেব' (১৯১৭), মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের 'পল্লী-সংস্কার' (১৯১৮), কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' (১৯২৫) উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-পরিবারের যে চিত্র রয়েছে তাতে জী.বকার ক্ষেত্রে অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ তাঁরা নিজেদের ক্ষয় উপলব্ধি করেও তার প্রতিবিধানে সক্ষম হন নি। সে তুলনায় মুহম্মদ নুরল হক চৌধুরীর 'আকর্ষণ' (১৯১৬) ও 'বঙ্গের জমিদারের (১৯২৫) চিত্র খানিকটা ভিন্নধর্মী। কারণ এসব উপন্যাসে বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি তার প্রতিবিধানের চেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। তবে মানসিকতার ক্ষেত্রে সমধর্মিতা উভয় শ্রেণীর পেশাকে একই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছে।

খ

কিছু ভিন্নধর্মী জমিদারের চিত্রও এসব উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। বিত্ত ও চিত্ত বিচারে এসব জমিদারও মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তাঁরা আধুনিক এবং প্রাগ্রসর। সমাজের গ.তর সঙ্গে তাল না রেখে তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, এবং আধুনিক ধ্যানধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এই চিন্তাধারার ফলে তাঁদের ভেতর বাস্তববোধের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, তাঁদের সমাজ এবং মূল্যবোধ ভাঙনের মুখে। অতএব এই ভাঙন রোধ করার জন্যে তাঁরা আধুনিক উপজীবিকা গ্রহণ করেছেন। এসব উপজীবিকার ভেতর প্রধান হল ব্যাবসা—যাকে এই শ্রেণীর রক্ষণশীল অংশ ঘৃণা করেন। এঁদের ভেতর রাজনীতি-সচেতনতা যেমন লক্ষ

করা যায়, তেমনি রাজনীতি-নিরপেক্ষ সমাজসেবাও দুর্লক্ষ্য নয়। যেসব উপন্যাসে এ ধরনের চিত্র রয়েছে তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হল এম. মনির হোসেনের 'অপ রচিতা' (১৯২৩), কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) 'কুহেলিকা' (১৯২৫), মোহাম্মদ গোলাম জিলানির 'ভুলের বাঁধন' (১৯২৭)। এসব উপন্যাসে আধুনিক ভূস্বামীদের নানা ধরনের বৃত্তির পরিচয় বিধৃত।

এম. মনির হোসেনের 'অপ.রচিতা'য় একজন জমি-দারের চিত্র রয়েছে, যিনি একাধারে চিকিৎসক এবং রাজনীতিক। তাঁর উদারচিততা তাঁর পেশার সঙ্গে সংগ.তিপূর্ণ নয় মনে হতে পারে। কারণ এই উপন্যাসে তাঁকে একজন ব্যক্তিস্বশালী পুরুষ হিসেবে চি.ত্রত করা হয়েছে। তাঁর ছেলে আনোয়ার চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে আরো বেশি অগ্রসর। সে রাজনীতি করে। তার রাজ-নীতি প্রগ.তিশীল। কাজী নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' উপন্যাসেও এজাতীয় একজন জমিদারতনয়ের চিত্র রয়েছে। সেও রাজনীতির প্র.তি অনুরাগী। তার রাজনীতি-চেতনা প্রাগ্রসর চিন্তা থেকে উৎসারিত। তাঁর চ.রত্রে লেখক সংস্কারমুক্ত জীবনচেতনার প.রচয়ও ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে তার ভেতর মধ্যবিত্তসুলভ মূল্যবোধ তুলনামূলকভাবে কম। এজন্যে চরিত্রটিকে এই পর্যায়ের ব্যতিক্রম হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়।

গ.

মুসলমানদের রচিত এসব উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা বেশি ফুটে উঠেছে উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর চিত্র। মন-মানসিকতার ক্ষেত্রে এঁরাই আধুনিক মুসলিম সমাজের সত্যিকার প্রতিনিধি। এ কারণে এঁরা সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরে নিজেদের সচল রেখেছেন এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এঁদের প্রধান বৃত্তি শিক্ষকতা, চাকুরি আর ব্যাবসাবাণিজ্য।

উল্লিখিত তিনটি বৃত্তির ভেতর শিক্ষাই সর্বাধিক সম্মানিত পেশা হিসেবে বিবেচিত। ফলে এজাতীয় উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে এই শিক্ষানু-রাগের চিত্র। এসব চত্রের বেশির ভাগই এসেছে নিম্নবিত্ত থেকে। ফলে দেখা যাবে, এসব চরিত্রের বেশির ভাগই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে শিক্ষালাভ করেছেন, এবং সেই দুর্লভ শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে অশেষ যত্নবান হয়েছেন। প্র.তকূল অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে সম্ভবত এসব লেখক মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার পেছনে দা.রদ্র্যই দায়ী, একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণ হিসেবে বহু প.ণ্ডতই দা.রদ্র্যকে দায়ী করেছেন।[৫] শুধু তাই নয়, কোনো কোনো প.ণ্ডত এই অনগ্রসরতার পেছনে একমাত্র দারিদ্র্যকেই দায়ী করেছেন, গোঁড়ামিকে নয়।[৬] একারণে প্রসঙ্গটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে এসব লেখক যে সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ এসব উপন্যাসে এর জন্যে একই সঙ্গে আর্থিক দৈন্য আর গোঁড়ামিকে দায়ী করা হয়েছে। মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের (১৮৭৮-১৯২৩) 'প্রেমের সমাধি' (১৯১৫) ও 'গরীবের মেয়ে' (১৯২৩) উপন্যাসে আর্থিক অবস্থাকে উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হিসেবে দেখানো হয়েছে। আবুল কাত্তাহ কোরেশীর 'নালেহা' (১৯২৪) উপন্যাসেও এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিধৃত। পক্ষান্তরে কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে একই সঙ্গে আর্থিক দৈন্য আর গোঁড়ামিকে আশঙ্কার জন্যে দায়ী করা হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক আবদুল্লাহ তার বাবার মৃত্যুর পর আর্থিক অনটনে পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, কিন্তু তার অর্থশালী গোঁড়া শ্বশুরের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেল না। শুধু আবদুল্লাহ নয়, তার শ্যালক আবদুল কাদেরকেও পিতার অমতে নিজের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে যতখানি সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে, অন্য কোনো উপন্যাসে তা দুর্লভ। সে হিসেবে উপন্যা.টিকে এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্মরূপে আখ্যা য়িত করা যায়।

এসব উপন্যাসে শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এই পেশাকে অন্য যে-কোনো পেশার তুলনায় মহৎ বলে চি.ত্রত করা হয়েছে। তার প্রমাণ, মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'প্রেমের সমাধি' উপন্যাসের নায়কের লোভনীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি ত্যাগ করে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে "অবলম্বন। প্রতিবেশী মোসলমান পল্লীগুলি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিলে তাহাদের কোন উপকার করিতে পারা যাইবে না মনে ক.রয়া" এই উপন্যাসের নায়ক মতিয়র রহমান শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেছে।[৭] 'গরীবের

মেয়ে' উপন্যাসের নায়ক নূর মহম্মদ মনে করে, "মসজিদে যে টাকা ব্যয় হইবে, তদ্দ্বারা মাদ্রাসা ও স্কুলের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া লওয়া" অনেক পুণ্যের কাজ।[৮] বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) উপন্যাসে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এই মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষানুরাগ মাতৃভাষাকে ঘিরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এসব উপন্যাসে নারীপুরুষের বাঙলা গ্রন্থপ্রীতি তার প্রমাণ। সেদিনের মুসলমানদের জন্যে বিষয়টি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এসময় একদল মুসলমান বাঙলা চর্চা তো দূরের কথা, বাঙলাকে মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতেই রাজি ছিলেন না।

আর যেসব পেশাকে ঘিরে সেদিনের এই শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তার ভেতর চাকরি ছিল প্রধান। এসব চাকরির বেশির ভাগই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাবরেজিস্ট্রার, সাব-ইনস্পেকটার, সাবজজ ইত্যাদি উচ্চপদ। তাঁদের চাল-চলনের সঙ্গে শিক্ষকদের চালচলনের পার্থক্য মৌলিক। সত্যিকার মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা এঁদের ভেতরই বেশি। কারণ এই মানসিকতার বিকাশে তাদের শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিকতা গভীরভাবে কাজ করেছে।

মুসলমানদের রচিত বহু উপন্যাসেই এই শ্রেণীর চিত্র রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বেশি দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) তাঁর 'আজাদ' (১৯৩০) উপন্যাসে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার এমন সজ্ঞান বিন্যাস এ পর্যায়ের অন্য কোনো উপন্যাসে নেই বললেই চলে। এই উপন্যাসে কিছু সরকারি চাকুরে সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যে সংলাপ রচনা করেছেন তার প্রতিটি ছত্রে পেশাজীবীদের এই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁরা একদিকে স্ব-স্ব বৃত্তির উন্নয়নে প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, অন্যদিকে নিজেদের উন্নতির জন্যে নানা ধরনের অধ্যাত্মসাধনায় নিয়োজিত। এই মনোভাবে প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর মানসিক অবক্ষয়ই প্রতিফলিত।

আকবরউদ্দিনের (১৮৯৬-১৯৭৮) 'মাটির মানুষ' (১৯২৯) উপন্যাসের একটি চরিত্রে এই স্তরের প্রকৃত মানসিকতা বিধৃত। সরকারি চাকরির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে প্রভূত প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা সত্ত্বেও সে তার শ্রেণীকে অতিক্রম করতে পারে নি। এ ব্যাপারে তার চেষ্টারও কোনো ত্রুটি ছিল না। মোহাম্মদ শাহ-জাহানের 'নিমকহারাম' (১৯২৪) উপন্যাসে দরিদ্র বছিরউদ্দির ভাই শাহাদৎ চাকরির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে অবশেষে তার ভাইকে ভুলে গেছে—যা মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার চূড়ান্ত প্রকাশ।

মুসলমানদের রচিত এসব উপন্যাসের এই পর্যায়ে যেসব বৃত্তিকে অবলম্বন করে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছে তার ভেতর ব্যাবসার একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি-বর্গের ভেতর ব্যাবসাপ্রীতি চারিয়ে দিয়েছেন। তাদের বেশির ভাগই শিক্ষকতার মতো পেশায় নিয়োজিত থেকেও ব্যাবসাবাণিজ্যের মধ্য দিয়ে প্রচুর অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয়েছে। 'প্রেমের সমাধি' ও 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসের নায়ক শিক্ষকতার সঙ্গে-সঙ্গে নানাধরনের ব্যাবসাবাণিজ্যে লিপ্ত থেকে ধীরে-ধীরে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

এসব উপন্যাসের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে পাটের ঠিকাদারি। 'আনোয়ারা' উপন্যাসে পাটের ঠিকাদার নুরুল এসলামের দৃষ্টিসীমায় আনোয়ারাকে স্থাপন করতে গিয়ে লেখক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।[৯] বন্দে আলী মিয়া (১৯০৮-১৯৭৯) 'ঘূর্ণঝড়' (১৯৩০) উপন্যাসেও একজন পাটের ঠিকাদারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। বেশারত আলী নামক দরিদ্র কৃষক এই ব্যাবসার মাধ্যমে অর্থসম্পদের অধিকারী হলেও, শেষ পর্যন্ত তার নিজের অবিমৃশ্যকারিতার দরুন সর্বস্বান্ত হয়েছে। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) 'রায়হান' (১৯১৮) উপন্যাসে ব্যাবসাকে মর্যাদা-পূর্ণ পেশা হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

এসব উপন্যাসে মহাজনি ব্যাবসাকেও উৎসাহিত করা হয়েছে। এই উৎসাহপ্রকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ইসলাম ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ।[১০] কাজী ইমদাদুল হক 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে একজন সুদখোরের চরিত্রে যে মহত্ত্ব আরোপ করেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। মীর মাহসেন আলী নামে এই ব্যক্তি সুদের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করতেন তার দ্বারা গ্রামের বহু লোকের লেখাপড়ায় অর্থ জোগান দিতেন। বাইরে লোকদেখানোর জন্যে অনেকে তাঁকে ঘৃণা করলেও ভেতরে-ভেতরে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত এবং তাঁর কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করত। তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা করার ব্যাপারেও অনেকে উৎসাহী ছিল। কোনো-কোনো উপন্যাসে ব্যাবসা বা মহাজনি করে হঠাৎ বড়োলোক হয়ে টাকার গরম সহ্য করতে না পেরে অপব্যয় করে আবারও সর্বস্বান্ত হয়েছে, এমন চিত্রও দেখা যায়। এসব উপন্যাসের কোথাও-কোথাও ব্যাবসা বা অন্য সূত্রে প্রাপ্ত অর্থসম্পদ নিয়ে কলহের চিত্র পাওয়া যায়। এসব দ্বন্দ্ব শ্রেণীচরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ।

এসব উপন্যাসে বিচিত্র আইন-ব্যাবসাও এই শ্রেণীর বিকাশের একটা অবলম্বন হিসেবে চিহ্নিত। তবে আইন-ব্যাবসার চিত্র তুলনামূলকভাবে কম। কোথাও-কোথাও এই ব্যাবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চিত্র পাওয়া গেলেও, উপন্যাসে ব্যাবসাটি তেমন গুরুত্ব লাভ করে নি। নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫) রচিত 'স্বপ্নদ্রষ্টা' (১৯২৩) উপন্যাসের নায়ক আনোয়ার আলি একজন আইনজীবী। সেহরতালের মামলায় আসামির পক্ষে লড়াই করে রাজনীতিসচেতনতার পরিচয় প্রদান করেছে। এই শ্রেণীর কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এটি একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। আনোয়ার আলীর সঙ্গে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে মামলায় অংশগ্রহণকারী হিন্দু আইনজীবীদের মিল রয়েছে।

দু

আমরা আগে উল্লেখ করেছি, মুসলমানদের ভেতর যে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছে তার প্রধান প্রেরণা পূর্ববঙ্গের পাট। এই ব্যাবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে তাঁরা প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে মিশেছেন এবং তাঁদের চালচলন, আচার-ব্যবহার আত্মসাৎ করেছেন। তবে পাটব্যাবসাকে কেন্দ্র করে একটি সংঘবদ্ধ মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠলেও, পাটচাষকে কেন্দ্র করে অর্থশালী হয়েছে, এমন চিত্র এসব উপন্যাসে নেই। কাজী আবদুল ওদুদের মতো দুয়েকজন লেখক গরিব কৃষকের চিত্র অঙ্কন করলেও, ('নদী-বক্ষে') বৃহত্তর মধ্যবিত্তশ্রেণীতে এদের অস্তিত্ব বিরল। সম্ভবত আজকের মতো সেদিনও কৃষকেরা সর্বাধিক নিষ্পেষিত ছিলেন। জোতদার শ্রেণীর অর্থাগমের উৎস জমাজমি হলেও তাঁদের সঙ্গে মাটির কোনো সম্পর্ক ছিল না। অতএব তাঁদের কৃষক বলা যায় না।

তবু এ ধরনের কিছু চিত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। মোহাম্মদ আবদুল হাকিম 'পল্লী-সংসার' উপন্যাসে একটি প্রতিনিধিত্বশীল মুসলিম বিত্তবান কৃষকের চিত্র অঙ্কন করেছেন। চাষাবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা অর্থের কল্যাণে এই পরিবার নিজের অস্তিত্বকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। গিয়াসুদ্দিন নামক এই কৃষকের ভেতর লেখক মধ্যবিত্তসুলভ ভাব ও অনুভূতি আরোপ করতে চেষ্টা করেছেন। এই ভদ্রলোক অর্থ এবং প্রতিপত্তির জোরে দরিদ্র আশরাফ শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য শেষের দিকে সামাজিক মানমর্যাদা রক্ষার জন্যে মামলামোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তিনি তাঁর মধ্যবিত্তসুলভ অহমিকা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এই উভয়বিধ কার্যক্রম এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত।

জসিমউদ্দিনের 'লায়লী' (১৯১৯) উপন্যাসেও এজাতীয় একটা চরিত্র রয়েছে। তোরাপ মণ্ডল নামে এই কৃষককেও এই শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আকবরউদ্দিন বর্ধিষ্ণু চাষীদের অস্তিত্বের নিদারুণ সংকট ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'মাটির মানুষ' উপন্যাসে। পর্যাপ্ত অর্থ এবং সরল ও সহজ হৃদয়ের অধিকারী হয়েও এসব কৃষকের প্রতিনিধি সমাজে স্বীকৃতি পায় নি। প্রকৃত চাষা হিম্মত হাজি তো দূরের কথা, 'চাষীর ছেলে' আবদুল লতিফ 'দারোগা' হয়ে নিজের গা থেকে চাষার গন্ধ মুছে ফেলার জন্যে বহু চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে শ্রেণীগত কোন্দলে আত্মরক্ষা করতে পারে নি, বরং শেষে তাকে গ্রামের চাষীদের অনুগ্রহ নিয়েই প্রাণত্যাগ করতে হল। মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও পরস্পর-বিরোধ এই চরিত্রে যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা এজাতীয় উপন্যাসে দুর্লভ।

তিন

মুসলিমরচিত বাঙলা উপন্যাসে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর পেশা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙলা ভাষা আর বাঙালি সংস্কৃতিবিমুখ একটি বিত্তশালী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজি-শিক্ষিত এই অংশের সংস্কৃতিচেতনার প্রধান উৎস ছিল উত্তর ভারতের মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল। এই কারণে তাদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের একটা মানসিক বিরোধ লেগেই ছিল। বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিবোধ প্রধানত

দুটি মানসিকতাকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। এর একটা হল, স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয়; অন্যটি স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন। মানসিকতার ক্ষেত্রে এই উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, পশ্চিমভারতীয় সংস্কৃতিতে আবিষ্ট বঙ্গদেশের 'আশরাফ' শ্রেণীর সঙ্গে এদের বিরোধ ছিল বেশ স্পষ্ট। পরবর্তী কালে যেসব মুসলমান উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের মন-মানসিকতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে উভয়বিধ ধ্যানধারণাই কাজ করেছে। এজন্যে এসব উপন্যাসে আমরা তার সপক্ষে ব্যাপক অনুশীলন লক্ষ করি। অতএব, এসব উপন্যাসে ঠিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর নানা ধরনের পেশার কথা যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি তাঁদের চলনে-বলনেও তার প্রভাব পড়েছে। কোনো-কোনো উপন্যাসে এই প্রভাব শনাক্ত করার ক্ষেত্রে খানিকটা জটিলতা দেখা দিলেও[১১] বহু উপন্যাসেই তা স্পষ্ট।[১২]

এই প্রভাব বহুবিস্তৃত। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে মুসলিম ঔপন্যাসিকেরা প্রায় উভয়বিধ প্রভাবই আত্মসাৎ করেছেন। ফলে তাদের ভেতর ধুতির প্রচলন যেমন লক্ষ করা যায়,[১৩] তেমনি মুসলমান সমাজে প্রচলিত টুপির প্রতি অনীহাও দুর্লক্ষ্য নয়।[১৪] সালামের চাইতে আদাব দেওয়াকে তাঁরা ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশার প্রভাব বলে মনে করতেন।[১৫] ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরো স্পষ্ট। এসব উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা বাঙলা ভাষার চর্চায় বিশেষ আগ্রহী।[১৬] শুধু তাই নয়, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান এই আগ্রহের ক্ষেত্রে ইংরেজির তুলনায় বাঙলার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[১৭] এসব উপন্যাসে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তাও বিস্ময়কর।[১৮] এ-জাতীয় সম্প্রীতির চিত্র যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া সম্ভব নয়, একথা না বললেও চলে। অতএব সামাজিক জীবনে হিন্দু প্রভাবের পটভূমিকা এই সুসম্পর্ক থেকে উৎসারিত। এই প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা নির্ণয় করার জন্যে এসব উপন্যাসে বর্ণিত সংস্কার-কুসংস্কারগুলো পর্যালোচনা করাই যথেষ্ট। তাতেও হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রভাব বিদ্যমান।[১৯]

অতএব এসব উপন্যাসে যে বিশাল সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে, তাতেই বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছে এবং পরিণামে তা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র হয়ে একটি আলাদা সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে—যা বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গেই অধিকতর জড়িত।

পাদটীকা :

১ শেখ আলীমুল্লাহ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (কলকাতা, ১৮৩১)।

২ Amalendu De, 'Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal', (Calcutta, 1974) ৩৩ পৃ।

৩ Rafiuddin Ahmed, 'The Bengal Muslims' (New Delhi, 1981) ১২৫ পৃ।

৪ The Muslim Chronicle, 20th January, 1904 উদ্ধৃত, Sufia Ahmed, 'Muslim Community in Bengal' (Dacca 1974) ২৪৮-৪৯ পৃ।

৫ বদরুদ্দিন উমর, 'মুসলিম সংস্কৃতির সংকট' (ঢাকা ১৯৬৭) ৪২ পৃ।

৬ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (তৃ-প্রকাশ ; ঢাকা, ১৯৮৩) ৭ পৃ।

৭ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, 'প্রেমের সমাধি' (পঞ্চদশ মুদ্রণ ; ঢাকা, ১৩৭৯) ৭৯ পৃ।

৮ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, 'গরীবের মেয়ে' (ষষ্ঠদশ মুদ্রণ ; ঢাকা, ১৩৭৯) ১৫১ পৃ।

৯ গোলাম মোস্তাফা, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' বৈশাখ ১৩২৬।

১০ 'কোরআন শরীফ', আল-বাকারাহ, অষ্টাত্রিংশ অনুচ্ছেদ, ২৭৫ আয়াত। কাজী আবদুল ওদুদ অনূদিত। ৫৪ পৃ।

১১ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম : পল্লীসংসার ; নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন : আনোয়ারা।

১২ এম. মনির হোসেন : অপরিচিতা ; কাজী নজরুল ইসলাম : কুহেলিকা।

১৩ মোজাম্মেল হক : জোহরা ; মোহাম্মদ আবদুল হাকিম : পল্লী-সংসার ; আবুল ফাত্তাহ কোরেশী : সালেহা।

১৪ মোহাম্মদ কোরবান আলী : মানোয়ারা ; আবুল ফাত্তাহ কোরেশী : সালেহা।

১৫ গোলাম মুস্তাফা : রূপের নেশা ; আবুল ফাত্তাহ কোরেশী : সালেহা।

১৬ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন : আনোয়ারা, গরীবের মেয়ে ; মোজাম্মেল হক : জোহরা ; কলিমউদ্দিন আহমদ : লায়লী ; নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী : স্বপ্নদৃষ্টা।

১৭ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান : রায়হান।

১৮ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম : পল্লী-সংসার মোহাম্মদ নুরুল হক চৌধুরী : আকর্ষণ ; এম. মনির হোসেন : অপরিচিতা ; মোহাম্মদ এবরাহিম : ঘোবেদা ; কাজী ইমদাদুল হক : আবদুল্লাহ।

১৯ নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী আত্মদান ; মোহম্মদ লুৎফর রহমান : রায়হান ; মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ; আনোয়ারা।

কলকাতায় রঙ্গমঞ্চের অগ্রদূত

গেরাসিম্ স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফ্—হায়াৎ মামুদ। বাংলা একাডেমী : ঢাকা। দুইশত টাকা।

গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেক বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। এই রুশ পরিব্রাজক সংগীতশিল্পী এবং বহুভাষাবিদ হিসাবে পরিচিত। একদা কলকাতায় এসে অষ্টাদশ শতকের অন্তিম দশকে বাঙলা নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করে যে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তা বাঙলা সাহিত্যের গবেষক, আলোচক ও পাঠক শ্রদ্ধা নিয়ে স্মরণ করেন। তাঁর অন্যান্য কীর্তি সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক তেমন কিছুই জানেন না; জীবনী সম্বন্ধেও সেই কথা, যদিচ সাম্প্রতিক কালে তাঁর কীর্তি এবং জীবনীর অনেক কিছুই প্রকাশিত হয়েছে। ড. হায়াৎ মামুদ সুদীর্ঘকাল পরিশ্রম করে লিয়েবেদেক সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বাধা পেয়েছেন অনেক। প্রথম বার তিনি লেনিনগ্রাডে শিক্ষার্থী হিসাবে অবস্থানের সময় কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিতীয় বার মসকোর প্রগতি প্রকাশনে চাকরি নিয়ে তথ্য সংগ্রহে মন দেন; কিন্তু অসুবিধে দেখা দেয়। তিনি বলেছেন, "লিয়েবেদেকের নথিপত্র-রচনাদি যেসব মহাফেজখানায় পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত হচ্ছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ ব্যবহার করার অনুমতি পাবার চেষ্টা সাড়ে তিন বৎসর ধরেই আমি করতে থাকি।...কোনো এক দুর্জ্ঞেয় কারণে মহাফেজখানার ব্যবহারের সুযোগ আমাকে দেওয়া হয় না।" যাই হোক, বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে তিনি লিয়েবেদেফের কর্মতৎপরতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। লিয়েবেদেফ ক্ষুদ্র আত্মকথা লিখেছেন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লেখেন নি; তাই অনেক জিজ্ঞাসাই অপূর্ণ থেকে যায়। লেখক এইসব জিজ্ঞাসা গবেষকের দৃষ্টিতে পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে লিয়েবেদেফের ঘটনাময় জীবনীর একটা রূপরেখা অঙ্কন করা যেতে পারে।

গ্রন্থসমালোচনা

লিয়েবেদেফের জন্ম ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ারস্লাভল্ শহরে। গির্জা-মঠ-ধর্মসাহিত্য, স্থাপত্য, নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গালয়ের জন্য সে যুগে শহরটি বিখ্যাত। লিয়েবেদেফের বাবার নাম স্তিফেন লিয়েবেদেক, মায়ের নাম পারাস্কোভিয়া লিয়েবেদেভা। আর ছিল দু ভাই, এক বোন। বাবার যাজক-বৃত্তি। তাঁকে দূরে থাকতে হত। সেই কারণে লিয়েবেদেফের পড়াশোনায় বাধা আসে। পনেরো বছর বয়সে তিনি পিতেরবুর্গ শহরে বাবার কাছে এসে তেরো বছর ছিলেন। এই সময় সংগীতশিক্ষায় দক্ষতা লাভ করেন। কিছু লেখাপড়াও চলে। তাঁর বাবার প্রভু (?) কাউনট রাজুমোফস্কির নেকনজরে পড়ে যান। বরাতও খুলে যায়। স্বয়ং রাজুমোফস্কি ছিলেন সংগীতস্রষ্টা, বেহালাবাদনশিল্পী। হেইডন্, মোজার্ট, বীটোফেন প্রমুখ মহাশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুত্ব। এই মণিকাঞ্চনসংযোগের ফল ভালোই হয়েছিল। লিয়েবেদেক রুশ সংগীতে এবং ভায়োলেনচেলোবাদনে দক্ষ হয়ে ওঠেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইউরোপ-ভ্রমণে উৎসাহিত হন। প্রথমে ভিয়েনায় (অস্ট্রিয়া,) তারপর ইতালি, ফ্রান্স, জারমানিতেও গিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে একাধিকবার যান। দেশ-ভ্রমণের সূত্রে ইউরোপীয় ভাষা কিছু কিছু আয়ত্তও করেছিলেন—তবে ইংরেজিতে আর ফরাসিতে ব্যুৎপত্তি ছিল বেশি।

এর পর ভারত-ভ্রমণের পালা। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ লিয়েবেদেক জাহাজে চড়ে ইংলানড থেকে মাদ্রাজ রওনা হন, পৌছান ওই বছরের ২৭শে জুলাই। মাদ্রাজের টাউন মেজর ক্যাপটেন উইলিয়ম সিডেনহাম বন্দরে লিয়েবেদেফকে শুধু সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানান নি, বার্ষিক দুশো পাউনড বেতনের চুক্তিতে সংগীতানুষ্ঠানের জন্য চাকরিও দিলেন। এই বেতনের সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও ছিল। এখানে তাঁর দু বছর বাস (১৭৮৫ জুলাই থেকে ১৭৮৭ জুলাই)। যৎকিঞ্চিৎ মালবার ভাষা (মালয়ালম না তামিল?) শিক্ষা করেছিলেন। মাদ্রাজে আর থাকতে চাইলেন না, বাঙলায় প্রচুর অর্থোপার্জনের সম্ভাবনায় মুগ্ধ হয়ে ভাগ্যান্বেষণের জন্য যাত্রা করলেন কলকাতা অভিমুখে।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে কলকাতায় আগমন। গুণগ্রাহী হিসাবে তিনি অনেককেই পেলেন, যেমন আলেকজানডার কিড (টাউন মেজর), মিসেস হে (সরকারের সেক্রেটারির পত্নী), বুরিশ ক্রিম্প (প্রভিন্সিয়াল জাজ), জাস্টিস হাইড এবং কোমপানির অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিগণ। এখানেও তাঁর সংগীতবিদ্যা উপার্জনের সহায়ক হয়ে উঠল। ২৪শে ডিসেমবর ১৭৮৭ ইনডিয়া গেজেটে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল: লিয়েবেদেক ২৮শে ডিসেমবর, শুক্রবার, ওলড কোর্ট হাউসে কনসার্টের আয়োজন করেছেন— কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত হবে। টিকিটের মূল্য এক মোহর। কয়েক বারই বিজ্ঞাপন লক্ষ করা যায়। তিনি নিজে উৎফুল্ল হয়ে জানিয়েছেন, ৫০০০ সিক্কা টাকা নীট আয় হয়েছিল। ড. মামুদ জানিয়েছেন, লিয়েবেদেফ হয়তো সংগীত শিক্ষা দিয়েও যথেষ্ট আয় করতেন। সেটা সম্ভব। কলকাতায় থাকতে তিনি অনেকবার বাসা বদল করেছিলেন। সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২৫নং ডোমটোলায় জগন্নাথ গাঙ্গুলির বাড়ি ভাড়া নেওয়া (১৭৯৫ জুন—১৭৯৭ জুন)।

১৭৯৫-১৭৯৭, এই দু বছর লিয়েবেদেফের ভারতবাসের গৌরবময় কাল। এর আগেই, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, মিশ্রভাষা (হিন্দুস্তানি ও সংস্কৃত) শেখবার জন্য একজন শিক্ষক পান। নাম পণ্ডিত গোলকনাথ দাস। ১৭৯৫ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সংগীতসাধক লিয়েবেদেফ মেতে উঠলেন ভাষাশিক্ষায়। হিন্দুস্তানি ও বাঙলা ভাষার শব্দাবলীর অনুবাদ, এমন-কি দৈনিক প্রয়োজনে যেসব সংলাপ ব্যবহৃত হয় তা-ও রচনা করলেন। জগন্মোহন বিদ্দে (বৈদ্য?), পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জগন্নাথ তর্ক (—?) প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা তাঁর কাজের প্রশংসা করেন। তারপরেই দুটি ইংরেজি নাটক The Disguise ও Love is the Best Doctor-এর বাঙলা অনুবাদে লিয়েবেদেফের আত্মনিয়োগ।

বিচিত্রকর্মা এই পুরুষটি নাট্যানুবাদেই স্থির থাকলেন না, মঞ্চাভিনয়ের দিকেও ঝুঁকলেন। প্রেরণাদাতা তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ। তিনি উৎসাহ দিলেন অভিনয়ের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী যোগাড় করে দেবেন। লিয়েবেদেফও অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করলেন গভরনর স্যর জন শোরের কাছে। অনুমতি পেলেন, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয় নি। তাই নিজের রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের আগে কোমপানির থিয়েটার ভাড়া নেবার জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন। ব্যর্থ হলেন। এমন-কি বিরুদ্ধ সমালোচনাও কপালে জুটল। কোমপানির থিয়েটার বলতে বোঝায় নিউ প্লে হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার—ইংরেজদের একচেটিয়া রঙ্গমঞ্চ। ২৫নং ডোমটোলাতে ৬০ টাকা ভাড়ায় জগন্নাথ গাঙ্গুলির বাড়ি ভাড়া নিয়ে লিয়েবেদেফ রঙ্গমঞ্চ বানিয়ে ফেললেন একক প্রচেষ্টায়। ছুতোর থেকে স্থপতি পর্যন্ত। তিন মাসে দোতলা নাট্যশালা গড়ে উঠল। নাম—বেঙ্গলি থিয়েটার। 'দ্য ডিসগাইজ' নাটকের প্রথম অভিনয় ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে নভেমবর, পরের অভিনয় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ। প্রথম রাত্রে নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপ অভিনীত হয়েছিল, দ্বিতীয় রাত্রে তিন-অঙ্ক নাটকের সবটাই—তবে এক ভাষাতে অভিনয় নয়। প্রথম অঙ্ক বাঙলা ভাষায়; দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হিন্দুস্তানি ভাষায়, দ্বিতীয় দৃশ্য বাঙলায় এবং তৃতীয় দৃশ্য ইংরেজিতে; তৃতীয় অঙ্ক সামগ্রিকভাবে বাঙলা ভাষায়। প্রচুর দর্শকের ভিড়। লিয়েবেদেক অত্যন্ত উৎসাহিত। নিয়মিত বাঙলা ও ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের গভরনরের অনুমতিও পেয়ে গেলেন। এমন-কি তিনি চাইলেন এশিয়াবাসীদের জন্য বাঙলা ও হিন্দুস্তানিতে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করতে—কলকাতায় এবং কলকাতার সন্নিকটে।

লিয়েবেদেফ থিয়েটারের আরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে চাইলেন; আর সেইটিই কাল হয়ে দাঁড়াল। কোনো এক সংগীতজ্ঞ বন্ধুর সুপারিশে জোসেফ ব্যাট্ল্‌কে তিনি নিয়োগ করলেন। লোকটি থিয়েটারের কাজ ভালো জানে, দৃশ্য অঙ্কনেও পটু। ১৭৯৬ সালের ১লা জুন তার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন লিয়েবেদেক। শঠ ব্যাট্লের সঙ্গে ক্যালকাটা থিয়েটারের টমাস রোওয়ার্থের যোগসাজসের ফলে লিয়েবেদেফের সর্বনাশ হয়ে গেল। থিয়েটার তো গেলই, নানাপ্রকার মামলায় তিনি জড়িয়ে পড়লেন। এমন-কি তাঁকে গ্রেপ্তার হতেও হয়েছিল। ইংরেজদের এই ব্যবহারে তিনি মর্মাহত হয়ে পড়েন। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি বলেছিলেন, "নাটক মঞ্চস্থ করিবার পশ্চাতে আমার উদ্দেশ্য অপূর্ব সুন্দর অপর থিয়েটারকে তাচ্ছিল্য করা ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও অন্যান্য হিন্দুস্থানী ভাষা প্রকৃষ্টতর রূপে যাহাতে শিখিতে পারা যায় তন্নিমিত্তে হিন্দুস্থানবাসীদের সহিত প্রশিক্ষণরত য়োরোপীয়দের ভাববিনিময়-মাধ্যম প্রস্তুত করিয়া দেওয়া।" (লিয়েবেদেফ, পৃ ১২১)।

ভগ্নমনোরথ হয়ে লিয়েবেদেফ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেমবর লর্ড টার্লো জাহাজে চেপে কলকাতা ত্যাগ

করলেন। নৌযাত্রাতে তাঁর দুর্ভোগ আর লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না। উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছেছিলেন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি। কেপ-টাউনে অবস্থানের সময় রুশ বাহিনীর পদস্থ অফিসারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু অফিসার তাঁকে 'তরলমতি' বলে বর্ণনা করেছেন। তবুও এখানে তাঁর জীবনে স্বস্তি আর সম্মান এসেছিল। কনসার্ট বাজিয়ে রোজগার করেন। তারপর আবার যাত্রা শুরু। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর কেপ-টাউন ত্যাগ করে সেনট হেলেনা হয়ে ইংল্যানড পৌছান পরের বছর ৩রা ফেব্রুয়ারি। এখানে এসে রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জাহাজের ব্যাপার ও ক্ষতিপূরণ নিয়ে কথা বলেও কোনো ফল পান নি। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। তখন সেখানে সম্রাট প্রথম আলেকসান্দর।

রাশিয়ায় ফিরে এলেন চব্বিশ বছর পর। তাঁর সঙ্গে ছিল লনডনে মুদ্রিত ব্যাকরণ বই (Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects), তাঁর নিজের অমুদ্রিত কিছু পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য সংগৃহীত পুথি। 'দ্য ডিসগাইজ' নাটকের বাঙলা অনুবাদ পাওয়া গেছে, কিন্তু "লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর' নাটকের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। প্রথম নাটকটির রচয়িতা রিচার্ড পল জড়্রেল (কিন্তু বিজ্ঞাপনে দেখা যায় এম. জড়্রেল); দ্বিতীয় নাটকটির রচয়িতা মলিয়্যার; কিন্তু এ নিয়েও সংশয় আছে। 'দ্য ডিসগাইজ' নাটকের নাম পাওয়া যায় একাধিক; যেমন 'কাল্পনিক সংবদল' 'কাল্পনিক', 'সংবদলা', 'সংবদোল' (বিজ্ঞাপনে)। তাঁর পাণ্ডুলিপির মধ্যে ছিল বিদ্যাসুন্দরের অনুবাদ (কিয়দংশ) মেমোরেনডাম', গণিত-সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি, হিন্দুস্তানি ও বাঙলা সঙ্গীত সংগ্রহ, শব্দকোষ ইত্যাদি। 'পক্ষপাতশূন্য পর্যবেক্ষণ' বইটি পরে প্রকাশিত হয়েছে—ভারতের নানা বিষয়ে আলোচনার একটি ক্ষুদ্র বিশ্বকোষ বিশেষ। সংগৃহীত পুথির মধ্যে ছিল 'অমরকোষ', 'হিতোপদেশ', হিন্দিতে রচিত 'মধুমালতীজৈত প্রসঙ্গ কথা', পঞ্জিকা।

সমস্ত রচনা প্রকাশের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক ১৮০০ রুব্‌ল বেতনে পররাষ্ট্র-বিষয়ক প্রশাসনিক দপ্তরে এশিয়া ডেস্কে চাকরি পান। বিবাহও করেন। বাড়িতে ছাপাখানা খুলে বই ছাপাবার পরিকল্পনা করেছিলেন, একটিমাত্র বই 'পক্ষপাতশূন্য পর্যবেক্ষণ' প্রকাশ করতে পারেন। অসুস্থতার জন্য তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যায়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

লিয়েবেদেফের সুদীর্ঘ ঘটনাময় জীবনের এই রূপরেখা থেকেই বোঝা যায়, সংগীতশিল্পী-রূপে তিনি দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু তিনি তাঁর শিল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি; শিল্প থেকে ভাষাশিক্ষা, ভাষাশিক্ষা থেকে নাট্যাভিনয়—এমনভাবেই তিনি আবর্তিত হয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে পূর্ব-ভারত সম্বন্ধে—সেখানকার ভাষা, সাহিত্য, আমোদপ্রমোদ ছিল তাঁর কৌতূহলের সামগ্রী। যদি ইংরেজ মহলের বিদ্বেষ আর চক্রান্ত দেখা না দিত তাহ'লে তাঁর কাছ থেকে আমরা আরও অনেক কিছু পেতাম, হয়তো বাঙলা নাট্যাভিনয়ের একটা ধারাবাহিকতা দেখা যেত। যাই হোক, ড. মামুদ প্রচুর পরিশ্রম করে যে বিরাট গ্রন্থটি উপহার দিয়েছেন তা মূল্যবান তথ্য আর আলোচনায় ঠাসা।

লিয়েবেদেফের জীবনীর অনেক কিছু জানা যায় না। তাঁর জীবনের কোনো-কোনো ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা নিরূপণ করাও কঠিন। যেমন লিয়েবেদেফের প্রতি কলকাতার ইংরেজদের বিদ্বেষ আর চক্রান্তের মূলে কী অভিপ্রায় কাজ করেছে? ড. মামুদ বলতে চেয়েছেন, সেই সময় রুশদের ভারত-গ্রাসের আশঙ্কা ছিল বলেই ইংরেজরা দুর্ব্যবহার করে থাকবে। কিন্তু আসলে তা মনে হয় না। বেঙ্গল থিয়েটারে প্রচুর দর্শকসমাগম হয়েছিল, এটা ক্যালকাটা থিয়েটার-ওয়ালাদের পছন্দ হয়নি। কারণ বেঙ্গল থিয়েটারে শুধু বাঙলা অভিনয় হলে হয়তো ততখানি ক্ষতি ছিল না, ইংরেজদের টানবার জন্য দ্বিতীয়বার বাঙলা, হিন্দুস্তানি, ইংরেজি অভিনয়েরও ব্যবস্থা চলে। কলকাতার ইংরেজদের কাছে বাঙলা হিন্দুস্তানি অপরিচিত ছিল না, ইংরেজিতো মাতৃভাষা; অপরপক্ষে তখন ক'জন বাঙালি ইংরেজি ভাষা বুঝত? তিনি তো প্রধান বিচারপতিকে বলেছিলেন, এটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, উৎকৃষ্টভাবে ভাষা শিক্ষার জন্য "হিন্দুস্থানবাসীদের সহিত প্রশিক্ষণরত য়ুরোপীয়দের ভাববিনিময়-মাধ্যম প্রস্তুত করিয়া দেওয়া"। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। জাতব্যাবসাদার ইংরেজরা ব্যাবসা ভালোই বোঝে। তাই একজন রুশ এসে তাদের একচেটিয়া ব্যাবসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তা তারা সহ্য

করতে পারে নি। এইজন্যই, মনে হয়, বিদ্বেষ, উপহাস, চক্রান্ত। আরও মনে হয়, লিয়েবেদেফ পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, তখন কেবল "এশীয়বাসীদের জন্য" নাট্যাভিনয়ের সংকল্প করেন। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর ভাগ্যে শনি প্রবেশ করেছে। কলকাতা থেকে ফিরে যাবার পথে তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহারের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইংরেজদের এই হীন বিদ্বেষ কি ছড়িয়ে পড়েছিল? তারই শিকার হলেন তিনি? অথচ রুশ অফিসারদের কাছে জানিয়েও তিনি কোনো প্রতিকার পান নি; বরং ঔদাসীন্যই প্রকাশ পেয়েছে। এইসব ঘটনাকে "ইঙ্গ-রুশ কূটনৈতিক সম্পর্ক ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চেহারা" বলাও চলে না—যদিও আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে। তবে সেটা অতি-সরলীকরণ। লেখককে এর জন্য ইতিহাসের বর্ণনা দিতে অনেক পৃষ্ঠা ব্যয় করতে হয়েছে।

ড. মামুদের বইটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত—ভূমিকা; (১) লিয়েবেদেফ-চর্চার আনুপূর্বিক ইতিহাস (১৮০৬-১৯৮১); (২) গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ: জীবনী (১৭৪৯-১৮১৭); (৩) লিয়েবেদেফের মানস-ভূগোল ও কর্মকাণ্ড; (৪) "ডিসগাইজ": নাট্যকার, মূল নাটক ভাষান্তরের সমস্যা-গ্রন্থ; (৫) স্বপ্ন বাস্তবে দোলাচল: ইয়ারস্লাভ্‌ল্‌-কলকাতায় নাটক; উপসংহার। একটি গবেষণাগ্রন্থ হুবহু ছাপালে অসুবিধা দেখা দেয়। তা অনেক সময় নীরস হয়ে ওঠে। প্রথম অধ্যায়ে লিয়েবেদেফ-চর্চার আনুপূর্বিক ইতিহাসে মুখ্য-গৌণ-উপেক্ষণীয় বহু তথ্যের সমাহার পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনারই স্থান হওয়া আবশ্যক। তেমনি পঞ্চম অধ্যায়ে ইয়ারস্লাভ্‌ল্‌-কলকাতায় নাটকের কথা বলতে গিয়ে তিনি দীর্ঘ ইতিহাস টেনেছেন—শুধু দুটি স্থানের ঐতিহ্যের সাদৃশ্যই সেখানে লক্ষ্য। এ ইতিহাস সংক্ষেপে বললে চিত্তাকর্ষক হত। ড. মামুদ লিয়েবেদেফের নাট্যাভিনয়ের আঙ্গিক ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করে আলোচনা করেছেন, তা সত্যই অনেকের কৌতূহল মেটাবে। পরবর্তী কালে এই নাট্যাভিনয়ের ঘটনা কতখানি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তা নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি জোরালো নয়। অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করবেন, কেননা দু-বার অভিনয়ের প্রেরণা পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করে যেতে পারে না, যদি না তার একটা ধারাবাহিকতা থাকে। গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশটি খুবই মূল্যবান—কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রতিলিপির সমাবেশ।

লেখকের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। লিস্ট / তালিকা অর্থে 'খতিয়ান', সার্ভে / পর্যবেক্ষণ অর্থে 'জরিপ', বিরুদ্ধ অর্থে 'বরখেলাপ', ভ্রমণ অর্থে 'প্রব্রজ্যা' পাঠকের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর। 'ছুটোছুটি', 'ঘোড়গাড়ীতে' এগুলি বোধ হয় আঞ্চলিক প্রয়োগ। অনুবাদের ভাষা অত্যন্ত আড়ষ্ট; তাছাড়া 'হওন', 'দেওন', 'পাওন', 'যাওন', 'করতঃ', 'আমারদিগের', 'লিখা', 'পঁহুছান', 'আইসেন', 'হইবেক'—শ্রুতিকটু। এর উপর মুদ্রণপ্রমাদ।

ড. মামুদ লিয়েবেদেফের জীবনী ও কর্মধারা আলোচনা করে রুশ-বাঙালি সংস্কৃতিসংযোগের আদিপর্বের ইতিহাস রচনা নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, এজন্য বাঙালিমাত্রেরই তিনি ধন্যবাদভাজন। তাঁর গ্রন্থখানি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধীনে পিএইচ ডি. উপাধির জন্য অনুমোদিত।

কালীপদ সিংহ

ওমর খৈয়ামের ভাবলোক

The Ruba'Iyat Of 'Umar-I-Khayyam. Persian Text edited from a Manuscrlpt dated 1605 A. D. with a facsimile of the Manuscript By M. Mahfuz-ul-Haq. The Asiatic Society, Calcutta First published 1939. Reprinted 1986. Rs. 80.

রোবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম (মূল ফারসি থেকে অনুবাদ)।—নূরুন নাহার বেগম। লেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪। ত্রিশ টাকা॥

বিখ্যাত ফারসি কবি ওমর খৈয়ামকে আমরা চিনেছি পশ্চিমের চোখে। এডওআর্ড ফিটজেরালড (১৮০৯-৮৩) ওমর খৈয়ামকে আধুনিক দুনিয়ায় পরিচিত করেন। এর জন্য তিনি কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। তিনি ওমর খৈয়ামকে দুনিয়ার লোকের কাছে পরিচিত করে দিয়েছেন, একথা যেমন

সত্য, তেমনি সত্য তিনি ওমর খৈয়ামের ভুল পরিচয় দিয়েছেন। ওমর খৈয়াম যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের পারস্যের এক বিখ্যাত দার্শনিক, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, শাস্ত্রজ্ঞ কবি ছিলেন, সেকথা আমরা ভুলেছি ফিটজেরালডের কল্যাণে। ওমর খৈয়াম পঞ্চেন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য, দুনিয়ার যত মজা সুরা আর সাকীর জন্য ব্যাকুল ছিলেন, আর সেই সঙ্গে এক অনিবার্য বিষাদে আক্রান্ত ছিলেন,—এমন ধারণা জন্মে দিয়েছিলেন ফিটজেরালড।

ফিটজেরালড ওমর খৈয়ামের দু-শ আশিটি রুবাই-এর স্বচ্ছন্দ পদ্যানুবাদ করেছিলেন। মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষায় তিনি আদৌ ব্যাকুল ছিলেন না। ফিটজেরালডের ইংরেজি কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রী। সেদিন থেকে পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে আমরাও ভাবতে শিখেছিলাম ওমর খৈয়াম এক ফূর্তিবাজ কবি। ফিটজেরালডের অনুবাদ "ট্রানস্লেশন" নয়, "ট্রান্সমিউটেশন"। আসলে তা ওমর খৈয়াম অবলম্বনে এক স্বাধীন সৃষ্টি। তিনি আপন রুচিমতো রুবাই বাছাই করে নিয়ে স্বাধীন পদ্যানুবাদ করেছিলেন। চিত্তচমৎকারী অন্ত্যমিলযুক্ত চতুষ্পদী (ক ক ছ ক) মারফত ফিটজেরালড গড়ে তুলেছিলেন উত্তেজক বাকপ্রতিমা; ছন্দের দোলায় দোলায়িত করেছিলেন পাঠকমনকে। ইন্দ্রিয়সেব্য দুনিয়ার যত ফূর্তি হাসি গান সুরা আর ভালোবাসায় জগতের দুয়ার তিনি খুলে দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর পদ্যানুবাদ পড়ে ভাবতে শিখেছিলাম ওমর খৈয়াম সাকী আর সুরার কবি। ফিটজেরালডের স্বাধীন পদ্যানুবাদের অনেক চরণই বহু মানুষের কাছে স্মৃতিধার্য হয়ে আছে। 'A Jug of wine, A Loaf of Bread—and Thou'—ফিটজেরালডের এই নিমন্ত্রণ কেবল স্মরণীয় নয়, তা গত শতাব্দের শেষার্ধের পশ্চিমী জগতের সংশয় আর বিষাদের উত্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফিটজেরালড তাঁর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ মারফত ওমর খৈয়ামের যে কাব্যলোক গড়ে তুলেছিলেন তার জনপ্রিয়তার উৎস কোথায়—এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আজ স্বীকার করতে হয় এই পদ্যানুবাদের মননপ্রসূত সংশয়, পলাতক মূল্যবোধ এবং অসার মানবজীবন সম্পর্কে এক ধরনের অনাসক্তি, জীবন আর মৃত্যুর অজেয় রহস্যভেদের ব্যাকুলতা এই পদ্যানুবাদকে করে তুলেছিল জনপ্রিয়। গত শতাব্দের পশ্চিমী জগতের মোহাবসান, অবসাদ আর সংশয়ের প্রতিধ্বনি পাঠক শুনেছিল এই পদ্যানুবাদে। আপাত-সুন্দর এই দুনিয়াকে শাসন করে এক রহস্যময় নিয়তি ('দ্য মুভিং ফিংগার রাইট্স্। অ্যান্ড হ্যাভিং রিট, / মুভস্ অন্')। এই সুন্দরী মোহময়ী ধরণী আমাদের আকর্ষণ করে—তার উপভোগের সুবিন্যস্ত জগৎ আমাদের দেয় ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি, কিন্তু আমরা মনে-মনে জানি, এই সৌন্দর্য আর ইন্দ্রিয়-উপভোগ ক্ষণিকের, তা এক অনিবার্য মৃত্যুদ্বারা শাসিত। এই বৈপরীত্য, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আমন্ত্রণ আর অনিবার্য বিষাদ আজ থেকে একশ বছর পূর্বেকার পশ্চিমী জগৎকে মুগ্ধ করেছিল। অবশ্য-স্বীকার্য, ফিটজেরালড-কৃত অনুবাদ কবি ওমর খৈয়ামের প্রকৃত ভাবলোক আর বাণীকে প্রকাশ করে নি।

আরো স্বীকার্য, বাঙলা কাব্যলোকে আমরা যে ওমর খৈয়ামকে পেয়েছি, তা এই ফিটজেরালড-কৃত পদ্যানুবাদের অনুসরণে। কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, আর কাজী নজরুল ইসলাম ওমর খৈয়ামের যে বাঙলা পদ্যানুবাদ করেছেন তা মূলত ফিটজেরালড-অনুসারী। বাংলা-দেশে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৫২) আর সিকান্দার আবু জাফর বাঙলা পদ্যানুবাদ করেছেন। তাঁদের অনুবাদও মূলত ফিটজেরালড-অনুসারী। এঁদের মধ্যে শহীদুল্লাহ আর নজরুল ইসলাম ফারসি জানতেন। কিন্তু নজরুলের অনুবাদেও মূলের প্রতি বিশ্বস্ততার অভাব আছে।

অধ্যাপক মাহফুজ-উল-হক ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ-এর যে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেছেন সেটি তিনি পেয়েছিলেন অধ্যাপক সয়ীদ নজীব আশরাফ নদভীর কাছ থেকে। এই এই পাণ্ডুলিপিটি ওমর খৈয়াম-চর্চায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক দিন পর্যন্ত এই ধারণা ছিল যে, পশ্চিমী জগৎ খৈয়ামের রুবাইয়াৎ-এর চিত্রিত পুঁথি তৈরি করেছে। সেই ধারণা বিপর্যস্ত হল নদভী-আবিষ্কৃত এবং মাহফুজ-উল-হক-সম্পাদিত এই চিত্রিত পুঁথি উদ্ধারের পরে। এখন পর্যন্ত এটিই দুনিয়ার প্রাচীনতম চিত্রিত পুঁথি।

এটির উদ্ধার-কাহিনী উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয়। পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয় ১৯২৮-২৯ সালে। এটি চিত্রিত-অনুলিখিত হয় ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে।

চিত্রিত পুঁথিটি সোনার জলে আঁকা রেখায় মণ্ডিত লাপিস লাজুলি ও অন্যান্য দামি রঙে মূল্যবান কাগজে চিত্রিত, সুন্দর নস্তালিক হস্তাক্ষরে লিখিত, নানা ফুল পাতা গাছ-চিত্রিত বর্ডার-এ ধৃত। সম্পাদক যুক্তিসহ সিদ্ধান্ত করেছেন, পুঁথিটি আমাদের জগদ্বিখ্যাত শিল্পী সুলতান আলি দ্বারা লিখিত এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা সোনা, লাপিস লাজুলি এবং অন্যান্য দামি রঙে অলংকৃত। সম্পাদক যুক্তিসহ অনুমান করেছেন, খুব সম্ভবত সুলতান হুসেন বেকরা-র (১৪৬৮-১৫০৫ খ্রী) প্রীত্যর্থে পুঁথিটি চিত্রিত হয়েছিল। পারস্যের হেরাতের অধিবাসী, বিদ্যা তথা সুকুমার কলার পৃষ্ঠপোষক এই সুলতানের রাজসভায় নবরত্নের দেখা পাওয়া যেত। হেরাত নগরের খ্যাতি ছিল সংস্কৃতি আর সুরুচির কেন্দ্র-রূপে। সুলতান হুসেন বেকরা ছিলেন তার উদার পোষ্টা। পুঁথি-অলংকরণে সমর্থ এক নিপুণ চিত্রীর দলকে গড়ে তুলেছিলেন বিখ্যাত শিল্পী সুলতান আলি। এই পুঁথি তাঁরই কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক। লনডনে ব্রিটিশ মুজিয়মে এবং প্যারীতে বিবলিওথেক নাসিওনেল-এ তাঁর চিত্রিত পুঁথি রক্ষিত আছে। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সম্পাদক। আমাদের আদর্শ পুঁথির পুষ্পিকায় ('কলোফোন') পুঁথি-শিল্পী সুলতান আলি লিখেছেন, 'ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ অনুলিখন ও চিত্রণের কাজ শেষ করলাম' (হিজরা ৯১১ / খ্রী ১৫০৬, মে ৫)।

পুঁথিটি সম্পাদকের বন্ধু অধ্যাপক সয়ীদ নজীব আসরাফ নদভী কেনেন কলকাতার এক পুরনো বই বিক্রিঅলার কাছ থেকে। সে কিনেছিল কলকাতার নিলামঅলা মেসার্স ম্যাকেনজি লায়াল কোম্পানির বিক্রয়-ঘর থেকে। কিনে অনেক দিন ফেলে রেখেছিল। নদভীকে সে এই মহামূল্যবান ময়লা শিথিল কিছুটা-ক্ষতিগ্রস্ত পুঁথিটি দেখায়। দেখামাত্র নদভী সেটি কিনে ফেলেন।

পুঁথিটি পারস্য থেকে ভারতে এল কী করে, তা বলা সুকঠিন। পনজাবের শিয়ালকোট জেলার পাসরুর তহসিলের এক হিন্দু পণ্ডিত দেবীদাস এটি সংগ্রহ করেছিলেন। পুঁথির উপরে তাঁর নাম লেখা আছে। ১৮৯১-এর ৩০শে মে তারিখে দেবীদাস পুঁথির উপরের মলাটে উর্দুতে লিখে রেখেছিলেন, 'পুঁথিটি খুব শোচনীয় অবস্থায় আমার কাছে আছে। এটির বড় বর্ডার ছিল। শমীম আহমদ দপ্তরিকে দিয়ে এটি বাঁধিয়ে নিয়েছি।' ১৫০৭ খ্রী লিখিত-চিত্রিত পুঁথিটি পারস্য থেকে কিভাবে ভারতে এল, তা জানা নেই। ১৮৯১ আর ১৮৯৬-এ লিখিত মন্তব্যের পর কীভাবে পনজাবের পাসরুর থেকে এটি কলকাতায় এল, তাও জানা নেই। দৈবাৎ এটি অধ্যাপক নদভীর হাতে পড়ে। স্বীকার্য, আকস্মিকভাবে উদ্ধার হল এই মহামূল্যবান পুঁথি। তার ফলে ওমর খৈয়াম-চর্চায় যুক্ত হল এক নতুন পরিচ্ছেদ।

সম্পাদক বিস্তারিতভাবে পুঁথিটির লিখন, অলংকরণ, চিত্রণের পরিচয় দিয়েছেন। এই পুঁথিতে পাঁচটি ক্ষুদ্র ছবি ('মিনিয়েচার') আছে। পারস্যের হেরাত নগরে খ্রী পঞ্চদশ শতকের শেষে আর ষোড়শ শতাব্দের সূচনায় যে চিত্রণকলা বিকাশ লাভ করেছিল তার বিশ্বস্ত পরিচায়ক এই পাঁচটি 'মিনিয়েচার'। বিখ্যাত শিল্পী বিজাদ অন্তত একটি মিনিয়েচার (৪১-সংখ্যক পাতার সামনের পিঠে চিত্রিত) এঁকেছিলেন বলে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত। বিজাদের স্বাক্ষরটি ছবিতে চিত্রিত প্রেমিকের কোমরবন্ধ-এ লুকানো আছে, সেটির প্রতি সম্পাদক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি ছাড়া বাকি চারটি মিনিয়েচার জোড়ায়-জোড়ায় আঁকা। তার সঙ্গে আছে রুবাই। পঞ্চমটি পাতাজোড়া ছবি। সঙ্গে আছে রুবাই, সম্পাদক ভূমিকায় যার স্বচ্ছন্দ ইংরেজি অনুবাদ দিয়েছেন—

Now that the Nightingale has struck his lyre,/Fill full the cup of joy for the days that be;/Awake, arise; for the spring is in full array/Accept naught but the brinming cup from Saqi's lily hands.

আফশোস, সম্পাদক মূল পুঁথিটি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন, কিন্তু কোনো বিশ্বস্ত ইংরেজি অনুবাদ দেন নি। তিনি ধরেই নিয়েছেন, এটি ফারসি-জানা পাঠকসমাজের জন্য। একথা সেদিন (১৯৩৯) হয়তো সত্য ছিল, কিন্তু আজ (১৯৮৬) পুনর্মুদ্রণকালে সোসাইটি-কর্তৃপক্ষ যথাযথ পুনর্মুদ্রণ করেই দায় শেষ করলেন, কোনো ফারসি-জানা গবেষক-পণ্ডিত-ভাষাবিদকে দিয়ে বিশ্বস্ত ইংরেজি অনুবাদ যোগ করে দিলেন না। আফশোস! বড়োই আফশোস! তথাপি পুনর্মুদ্রণের জন্য সোসাইটিকে ধন্যবাদ।

যা পেয়েছি তা অশেষ মূল্যবান। আগাগোড়া আর্টপেপারে সুমুদ্রিত এই পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থে পুরো পুঁথিটি ব্লক করে ছাপা হয়েছে, সেই সঙ্গে তিনটি রঙিন 'মিনিয়েচার'। মোট ৫৪টি পাতার বিশ্বস্ত প্রতিচিত্র আমরা এখানে পাই। সেই সঙ্গে পাই আলাদাভাবে ফারসিতে মুদ্রিত ২০৬টি রুবাই (অবশ্য বিনা অনুবাদে)। সেই সঙ্গে আছে ওমর

খৈয়ামের রুবাইয়াৎ-এর 'কনকর্ডান্‌স্‌।' বিভিন্ন সম্পাদিত সংস্করণের তুলনামূলক সারণিতে গৃহীত রুবাইগুলির পরিচয় পাঠককে ওমর খৈয়ামের কাব্যলোকে পৌঁছতে সাহায্য করে। আলোচ্যমান আশরাফ পুঁথি, বডলিয়ান পুঁথি, রোজেন পুঁথি (দুটি), কলকাতা মাদ্রাসা পুঁথি, রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি, নিকোলাস-পুঁথি, হুইনফিল্ড-পুঁথি, অমৃতসর-পুঁথি, লখনউ-পুঁথি—এগারটি সম্পাদিত পুঁথির এই 'কনকর্ডান্‌স্‌' সম্পাদকের বিপুল পরিশ্রম, নিপুণ সাহিত্যবিচার এবং গভীর রসবোধের পরিচয়স্থল। তার প্রমাণ কনকর্ডান্‌স্‌, রুবাইগুলির আসল-নকল যাচাই এবং পুঁথির লিখন-অলংকরণ-চিত্রণবিচার।

এশিয়াটিক সোসাইটি-প্রকাশিত এই মূল্যবান গবেষণাকর্মের পাশে দাঁড়াবার স্পর্ধা করে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বইটি। লেখিকার ফারসি-জ্ঞান, সাহিত্যরুচি আর তুলনামূলক বিচারসামর্থ্যের পরিচয়স্থল বইটি। এর ভূমিকাটি মূল্যবান। তার দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে ওমর খৈয়ামের কবিতার আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে ওমর খৈয়ামের এতাবৎকাল বাঙলা অনুবাদের ত্রুটিবিচার।

ওমর খৈয়ামের নামে প্রচলিত বারো শ রুবাইএর সবই তাঁর লেখা নয়। পণ্ডিতেরা অল্পসংখ্যক রুবাইকেই ওমর খৈয়ামের লেখা বলে শনাক্ত করেছেন। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন দুই সম্পাদক—মাহফুজ-উল-হক আর নূরুন নাহার বেগম। শেষোক্ত জন প্রখ্যাত ইরাণী গবেষক ড. সাদাক হেদায়েত-কর্তৃক সংকলিত 'তারানেহাই খাইয়াম' কাব্যের 'পরে নির্ভরকরেছেন। উক্ত গ্রন্থে সংকলিত ওমর খৈয়ামের ১৪৩টি রুবাই-এর মধ্যে যেগুলিতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সেগুলি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৯০টি রুবাইএর কাব্যানুবাদ পেশ করেছেন। লেখিকা মূল ফারসি রুবাই বাঙলা হরফে তুলে দিয়েছেন, পাশাপাশি দিয়েছেন কাব্যানুবাদ। এই অনুবাদ মূলানুগ এবং সরল। তার সামান্য পরিচয় নিই :

মা লওবতে গনিম ও ফল্‌কে লওবতে বায় / আয় রোই হকিকী আয় রোই মজায়্‌ / ইয়েক চান্দ দর ইন্‌ বেসাত বাজি কারদিম্‌ / রাফতিম্‌ বেসিন্দুকে আদম ইয়েক্‌ ইয়েক্‌ বায়্‌।/

(রুবাই সংখ্যা ৩৪)

খেলছে আকাশ মোদের নিয়ে, খেলার পুতুল আমরা সবাই / সবটুকু এর সত্যি জেনো, একটি কণাও মিথ্যে যে নাই। / এই পৃথিবীর মঞ্চ 'পরে, খেলেছিলেম ক্ষণেক তরে, / ঢুকিয়ে দিল মরণ খোপে, সাঙ্গ খেলা হল যে ভাই॥

আর-একটি রুবাই :

সাকী গমে মান্‌ বুলন্দ্‌ আওয়ায্‌ শুদেহ্‌ আস্ত্‌ / সর্‌ মস্তিয়ে মান্‌ বীরুন য্‌ আন্দায্‌ শুদেহ্‌ আস্ত্‌ / বা মুই সপিদ সর্‌ খোশম্‌ কায্‌ মেই ও তু / পীরানে সরম্‌ বাহারে দিল্‌ তাজেহ্‌ শুদেহ্‌ আস্ত্‌।

(রুবাই সংখ্যা ৬২)

মোর বেদনা পেয়ালা পূর্ণ হয়েছে, উপচে পড়েগো সাকী / প্রাণ ভরে সুরা পান করে আমি মত্ত হয়েছি সাকী। / তোমাকে এবং সুরা কন্যাকে পেয়েছি যখন পাশে / হৃদয় এখনও নবীন, যদিও শুভ্র কেশ গো সাকী॥

অপর একটি রুবাই—যা বহুল প্রচারিত:

তুঙ্গি মেই লাল খা'হাম ও দীওয়ানি / সদ্‌ রমকি বায়দ ও নেস্‌ফে নানি / ওয়ানগাহ্‌ মান ও তু নিশাস্‌তে দর্‌ এইরানি / খোশ্‌ তর বুয়াদ আন্‌ য্‌ মুলকত্‌ সুলতানি।

(রুবাইসংখ্যা ৬০)

একটি সুরাহী রঙিন মদিরা অর্ধেক রুটি হাতে / আরও একখানা কবিতার বই, এসো প্রিয়ে মোর সাথে, / শুধু তুমি আমি একেলা বিজনে, একান্ত নিরজন, / পাই যদি কভু, ভুলবে না মন রাজার রাজ্যটাতে॥

শ্রীমতী নূরুন নাহার বেগমের বইয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ—ওমর খৈয়ামের বাঙলা পদ্যানুবাদের ত্রুটিবিচার। কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব আর নজরুল ইসলাম-কৃত অনুবাদ মূলের পাশাপাশি রেখে লেখিকা দেখিয়েছেন বিচ্যুতি কতদূর ঘটেছে। যেমন,

মূল ফারসি রুবাই :

চুন্‌ লালা বেহ্‌ নওরোজ কদেহ্‌ গীর বেদস্ত্‌ / বা লালারুখি আগর তুরা ফুরসত্‌ হাস্ত্‌ / মেই নোশ বেহ্‌ খুররুমি কাইন্‌ চরখে কবুদ / নাগাহ্‌ তুরা চু খাক গরদানদ্‌ পুস্ত।

(সংখ্যা ৬)

গদ্য অনুবাদ :

নওরোজের টিউলিপ ফুলের সম পান-পেয়ালা হাতে লও। যদি অবসর পাও তাহলে কোনো ফুলের মতো সুন্দরীকে সাথে নিয়ে হর্ষচিত্তে সুরা পান কর। কেন না এই অন্ধকারে নিমগ্ন মহাশূন্য তোমাকে অকস্মাৎ অপ্রয়োজনীয় ধূলিতে পরিণত করবে॥

—(নূরুন নাহার বেগমের অনুবাদ)

('নওরোজ' অর্থ নববর্ষ—পারস্যে বসন্ত ঋতুর প্রথম দিন। 'লালা' শব্দের অর্থ টিউলিপ ফুল। ওমর খৈয়াম তাঁর রোবাইয়াৎ-এর কয়েক স্থানে টিউলিপ

ফুলকে মদের পেয়ালার সাথে তুলনা করেছেন —নূ. না. বে.)

ফিটজেরালডের অনুবাদ :

As then the Tulip for her wonted sup / Of heavealy Vintage lifts her chalice up, / Do you, twin off spring of the soil, till Heav'n / To Earth invert you like an empty Cup. /

(Rubai XXXIX)

কান্তি ঘোষের অনুবাদ :

সদ্য-ফোটা এই যে গোলাপ, / গন্ধ-প্রীতি-উজল মুখ, / বলছে নাকি—মিথ্যা এ সব, / এই ক্ষণিকের দুঃখ সুখ। / পৃথ্বী-বুকে উঠছি ফুটে / গর্বে পরি' রঙীন সাজ—পাপড়ি ফুটে ছড়িয়ে মোদের / জীবন-রেণু পথের মাঝ।

(রোবাই ১৩)

নূ. না. বে-র মন্তব্য : 'উপরের দুটি অনুবাদের সাথে মূল রোবাই-এর কোনো মিলই নেই।'

দ্বিতীয় নমুনা :

ইমশব মেই জাম ইয়েক্‌মনি খা'হাম্‌ করদ্‌ / খুদ্‌ রা বেহ্‌ দো জাম মেই গণি খা'হাম্‌ করদ্‌ / আউয়াল সে তালাক আক্‌ল্‌ ও দীন খা'হাম দাদ্‌ / পস্‌ দুখ্‌তরে রয্‌ রা বেযনি খা'হাম্‌ করদ্‌।

(রুবাই সংখ্যা ৭)

গদ্য অনুবাদ (নূ. না. বে-কৃত) :

অদ্য রজনীতে আমি একমনী মদের পাত্র নিঃশেষ করব। পরেই আবার দুই পাত্র মদ পান করলে নিজেকে ঐশ্বর্যশালী মনে করব। প্রথমে যুক্তি ও ধর্মকে তিন তালাক দিয়ে নির্বাসনে পাঠাব। পর মুহূর্তেই আঙুরলতার কন্যাকে বিবাহ করব। (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইরানে প্রচলিত এক মনের পরিমাণ আমাদের মাপের চল্লিশ সের নয়, সেখানে একমন তিন কিলোগ্রামের সমতুল।)

ফিটজেরালডের অনুবাদ :

You know, my Friends, how bravely in my House / For a new Marriage I did make Carouse : / Divorced old barren Reason from my Bed. / And took the Daughter of the Vine to Spouse. / (Rubai LIII)

কান্তি ঘোষের অনুবাদ :

জানিস্‌ তো সব বন্ধু তোরা—/ কাণ্ডটাই বা কয়দিনের— / বাস্তভিটায় কাটল যে মোর / নূতন বিয়ের স্ফূর্তিজের।/ বন্ধ্যা বধূ যুক্তি দেবী—/ সেই রাতে তার নির্বাসন,—/ সেই বাসরে নূতন বধূ / আঙুরলতার সম্ভাষণ।

(রোবাই ৪০)

নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ :

তোমরা জানো বন্ধু আমার / সেই সেদিনের শুভক্ষণ, / নূতন বিয়ের লগ্নে গৃহে / পানোৎসবের আয়োজন ; / তাড়িয়ে দিয়ে সেদিন আমার / সুপ্তি-বিহীন শয্যা হতে, / বর্ষীয়সী বন্ধ্যা-নারী / যুক্তিটারে মুক্তি-স্রোতে, / রূপের মধু নূতন বধূ / আঙুর বালায় প্রাণের 'পরে / বরণ করে নিয়েছি মোর /এই জীবনের বাসর ঘরে। /

(রোবাই ৮৪)

উপরোক্ত তিনটি অনুবাদের প্রথম দুটি চরণ মূল ফারসি রোবাই থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।—নূ. না. বে-র মন্তব্য।

তৃতীয় ও শেষ নমুনা :

ইয়ারান্‌ বেমুআফেক্কাত্‌ চু দিদার কুনীদ / বায়দ কেহ্‌ য্‌ দুস্ত্‌ ইয়াদ বেসিয়ার কুনীদ / চুন্‌ বাদেইয়ে খোশ্‌-গওয়ার নুশীদ বেহম্‌ / নওবতে চু বেমা রসদ নগুন্‌সার কুনীদ।

(রুবাই নংখ্যা ১৬)

গদ্য অনুবাদ (নূ. না. বে-কৃত) :

হে প্রিয় বন্ধুগণ, যখন তোমরা সকলে আবার একত্রে মিলিত হবে বিগত বন্ধুদের তোমরা তখন অবশ্যই স্মরণ করো। যখন সকলে এক সাথে সুরা পানে মগ্ন হবে (সুরার পাত্র সবার হাতে হাতে ঘুরতে থাকবে) এবং আমার পালা যখন আসবে তখন আমার শূন্য স্থানটিতে পানপাত্রখানি উপুড় করে দিও।

ফিটজেরালডের অনুবাদ :

And when yourself with silver Foot shall pass, / Among the guests star- scatter'd on the Grass, / And in your joyous errand reach the spot / Where I made One—turn down an empty glass ! /

(Rubai CIX)

কান্তি ঘোষের অনুবাদ :

বিভোর প্রাণে আস্‌বে যেদিন—/ আকুল মিলন প্রতীক্ষায় / তৃণাসনে অতিথ্‌ সভা / ছড়িয়ে যেথা তারার প্রায় ; / উজল পায়ে আস্‌বে যখন / আমার যেথায় ছিল স্থান,/ উপুড় করে রেখো সেথায় / আমার শূন্য পাত্রখান।

(রোবাই ৫)

নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ :

তারপরে, একদা যেদিন / কেলি তব চরণ-রঙীন / লীলা-ভরে আসিবে চপল, / যেথা নব অভ্যাগত দল / তোমার প্রসাদ প্রতীক্ষায় / বসে আছে তৃণাসনে তারকার প্রায়, / তারই মাঝে হেসে যবে / আনন্দ বিতরি যাবে তুমি—/ এস, যেথা ছিল

মোর / হৃদয়ের সুখ-তীর্থ-ভূমি। / করুণায় ভরি' তব প্রাণ, ঢেলে দিও সেথা প্রিয় / নিঃশেষিত শূন্য পাত্রখান! (রোবাই ১৯২)

নূ. না. বে-র মন্তব্য :

'উপরের তিনটি অনুবাদেরই অনুবাদকবৃন্দ সাকীকে সম্বোধন করে রোবাইটি রচনা করেছেন। কিন্তু মূল রোবাইতে ওমর খৈয়াম সম্বোধন করেছেন তাঁরই মতো মদ্যপায়ী সাথীদের। উপরন্তু অনুবাদগুলির শেষ চরণটি ব্যতীত অন্য চরণগুলি মূল রোবাই-এর সাথে মোটেও সমার্থক নয়।'

ফিটজেরালড আর বঙ্গীয় অনুবাদকেরা মূল ফারসি রুবাই থেকে কতদূর বিচ্যুত তার যথেষ্ট পরিচয় এই তিন উদাহরণে লভ্য।

কান্তি ঘোষ আর নরেন্দ্র দেব ফারসি জানতেন না, কিন্তু কাজি নজরুল ইসলাম জানতেন। তথাপি তাঁর অনুবাদেও দেখা গেছে ত্রুটি-বিচ্যুতি। নূকন নাহার বেগম তারও পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,

হর্ সর্জে কেহ্ বর্ কিনারে জুই রিস্তে আস্ত্ / গোই য্ লবে ফেরেশ্তে খোই রিস্তে আস্ত্ / পা বর্ হর্ সর্জে বেখোয়ারি না নেহি / কান সর্জে য্ খাক লালা রোই রিস্তে আস্ত্। (পৃ ৪১)

গদ্য-অনুবাদ (নূ. না. বে-কৃত) :

স্রোতস্বিনীর তীরে যে সবুজ শ্যামল দূর্বাদল, হয়তো কোনো সুন্দরীর কোমল ওষ্ঠ থেকে এদের জন্ম। প্রতি দূর্বাদলের উপরে ধীরে চরণ ফেল, কেননা পুষ্পসম সুন্দরীর দেহ-ধূলি থেকে হয়তো এরা উত্থিত।

নজরুল ইসলামের অনুবাদ :

তুমি আমি জন্মিনিকো—যখন শুধু বিরাম-হীন / নিশীথিনীর গলা ধরে ফিরতো হোথায় উজল দিন,—/ বন্ধু, ধীরে চরণ ফেলো! কাজল-আঁখি সুন্দরীর / আঁখির তারা আছে হোথায় হয়ত ধূলির অঞ্চলীন! (রোবাই ২৫)

নূ. না. বে-র মন্তব্য :

"উপরের অনুবাদটির প্রথম ছুটি লাইন মূল ফারসি রুবাই থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্য ছুটি লাইন মূল রোবাই-এর ভাবানুবাদ মাত্র।"

নজরুল ইসলামের কলমে মূলের সঙ্গে সংগতিবিহীন অনুবাদ হয়েছে, সম্পূর্ণ আলাদা অনুবাদ হয়েছে, এমনকি ভুল অনুবাদ হয়েছে, তার উদাহরণ দিয়েছেন নূকন নাহার বেগম। নজরুলের অনুবাদের রুবাই সংখ্যা ১, ২৫, ২৭, ৩৫, ৪০, ১৬৪ তার পরিচয়-স্থল। ভুল অনুবাদের কথায় অনেক নজরুল-অনুরাগী শিউরে উঠবেন। কিন্তু নূ. না. বে উদাহরণ দিয়েছেন। মূলে আছে : 'গাওইত্ বর্ আসমান কবিন পাবভীন'। লেখিবার গদ্যানুবাদ : 'আকাশে পারভীন নামের তারার কাছে আছে একটি বলদ'। নজরুলের অনুবাদে (রুবাই ১৬৪) তা হয়েছে : 'আসমানে এক বলীবর্দ রয় 'পর্বিন' নাম তাহার'। (পৃ ৪৩)।

স্বীকার্য, নূকন নাহার বেগম ওমর খৈয়াম-চর্চায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছেন। ফিটজেরালডের অনুবাদ (১৮৫৯), হুইনফিল্ডের অনুবাদ (১৮৮৩), ই. ডি. জনসন, জন পেইনের অনুবাদ, ফ্রেডরিক রোজেনের অনুবাদ (১৯৩৫), জুকোভস্কির ওমর-চর্চা (১৮৯৭), ডেনিসন-রসের আলোচনা (১৯২৭), আর্থার ক্রিস্টেনসনের আলোচনা (১৯০৫) পড়ে আমরা জেনেছি ওমর খৈয়ামকে। এতদিনে শ্রীমতী নূকন নাহার বেগম আমাদের সরাসরি খৈয়ামের কাব্যালোকে প্রবেশাধিকার দিলেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি অসাধারণ ইন্দোনেশীয় উপন্যাস

জাভা, মালয়, সুমাত্রা ইত্যাদি হাজার খানেক দ্বীপের সমষ্টিগত নাম ইন্দোনেশিয়া। এদের সভ্যতা অতি প্রাচীন। কিন্তু ওলন্দাজরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করবার আগে এই দ্বীপপুঞ্জে কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন রাজবংশের শাসন প্রচলিত ছিল। অবশ্য ঐতিহাসিক কারণে সেইসব রাজবংশের পরিবর্তনও ঘটত। এই দ্বীপগুলির মধ্যে অন্তর্যুদ্ধও বিরল ছিল না। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসী। এখনও অল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত এবং গ্রামের মানুষ তাই বলে।

তারপর ইংরেজরা যেমন একদিন জাহাজে চড়ে, দাঁড়িপাল্লা হাতে ব্যাবসা করতে এসে ধীরে-ধীরে গোটা ভারতবর্ষকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করল, ওলন্দাজরাও সেই ঘটনাই ঘটাল এই দ্বীপপুঞ্জে। তখন ধীরে-ধীরে কেন্দ্রীয় শাসন স্থাপিত হল। সবগুলো দ্বীপেরই প্রভু হল হল্যানডের The Jan Company, ভারতবর্ষে যেমন হয়েছিল ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানি। ওলন্দাজেরা তাদের এই উপনিবেশের নামকরণ করল Dutch East Indies। শাসনযন্ত্রের ভাষা হল ডাচ (ওলন্দাজ)। ভারতবর্ষেও যেমন উপরের শ্রেণীর মানুষ কিছুদিনের ভিতরই ইংরেজ ভাষা শিখে নিয়েছিল, অন্তত কাজ চালানোর মতন—এখানেও তাই হল। ডাচই প্রধানতম ভাষা হয়ে দাঁড়াল। উচ্চাভিলাষী দেশী মানুষরা ডাচ ভাষাই শিখতে শুরু করল। কিন্তু অন্য স্বদেশী ভাষাগুলোর চলন কিন্তু বন্ধ হল না। দীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী এই ভাষাগুলো শিক্ষিত মানুষও ব্যবহার করত—যদিও রাজভাষা হল ডাচ। ডাচ ভাষার মাধ্যমেই ইউরোপীয় বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন এই দেশের শিক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছল—পৌঁছল ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচুর সম্ভার। ঘরকুনো দ্বীপবাসীর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পৃথিবীর-এক-কোনায়-পড়ে-থাকা এই দ্বীপপুঞ্জের তরুণরা একদিন ভেবেছিল—ইউরোপের সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান নন্দনতত্ত্ব সবকিছুই হল্যানড থেকে সংগ্রহ করে আধুনিকতার আলোয় সাজিয়ে দেবে আপন দেশকে। অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, সাহিত্যরচনা শুরু করেছিল ডাচ ভাষায়। হল্যানডকেই তারা গুরু বলে মেনেছিল। ভেবেছিল, ইউরোপের শিক্ষিত মানুষই শিক্ষায় দীক্ষায় সভ্যতায় সবচাইতে অগ্রগণ্য। একমাত্র তাঁরাই অনুগমনযোগ্য।

কিন্তু সেই স্বপ্ন একদিন ভাঙল। সেই স্বপ্নভঙ্গের কাহিনীই বলা হয়েছে এখানে আলোচিত উপন্যাসে।

উপন্যাসটি লেখা হয়েছে Bahasa Indonesia-তে। সম্মিলিত দ্বীপগুলি এখন ইন্দোনেশিয়া নামে পরিচিত, এই ইন্দোনেশিয়ার প্রধানতম ভাষা হল এই Bahasa Indonesia। লেখা হয় রোমক লিপিতে। এখন এই ভাষাতেই সবাই কথা বলে আর লেখে। তবে এ ছাড়া আরও প্রায় ২০০টি ভাষা এইসব দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে বলা হয়। অধুনা ইন্দোনেশীয় সাহিত্যে 'বাহাসা ইন্দোনেশিয়া' এবং দু-শ আঞ্চলিক ভাষার সহ-অবস্থান।

ধরা যায়, ১৯২০ সালের পর থেকেই 'বাহাসা ইন্দোনেশিয়া'তেই ইউরোপীয় মডেলের রোমানটিক গল্প-উপন্যাস লেখা শুরু হয়। ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক ডাচ সরকার

বিশ্বসাহিত্য

সেকালে এইসব বই ছাপাতে, প্রকাশ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করত। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালের অগস্ট মাসে। আর দেশের সরকার এর প্রচলন বন্ধ করে দেয় ১৯৮১ সালের মে মাসে, কিন্তু এই কয় মাসের মধ্যেই এই বইয়ের পাঁচটি সংস্করণ বেরিয়ে যায়। ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ম্যাক্স্ লেন, প্রকাশ করেন পেঙ্গুইন বুকস, অসট্রেলিয়া ১৯৮২ সালে। বইটিরও ইতিমধ্যে তিনটি সংস্করণ হয়েছে। যত দূর জানি, অন্য কয়েকটি বিদেশী ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছে এই উপন্যাস।

উপন্যাসটির কাহিনী উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে বিধৃত। ডাচ সাম্রাজ্যবাদ তখন প্রবলপরাক্রান্ত। ওই দেশের মানুষ তখনও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শেখে নি। কিন্তু নানা রকমের বিধিনিষেধের বাধায় পরাধীন মানুষের জীবনের পূর্ণ স্ফুরণ ছিল অসম্ভব।

এইসব বাধার ভিতর সবচেয়ে প্রবল বাধা হল সেদেশের

Bumi Manusia (This Earth of Mankind) by Pramoedya Ananta Toer

জাতিবিভেদ বা কাস্ট্ সিস্টেম। সমস্ত বইটিতেই এই কাস্ট্ সিস্টেমের অভিব্যক্তি—যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। এই জাতিবিভাজন তিন ভাগে বিভক্ত। এই বিন্যাস কিন্তু সমাজ-জীবন থেকে উদ্ভূত হয় নি। এটা ডাচ প্রভুদের প্রবর্তন। 'পিয়োর', 'মিক্স্ড্' আর 'নেটিভ'—এই তিন বর্গে ভাগ করা ডাচ ইন্ডিজের সব মানুষ। 'পিয়োর' হল তারাই যাদের ধমনীতে পবিত্র ডাচ রক্ত বইছে। 'মিক্স্ড্' হল সেইসব মানুষ যাদের রক্তে কিছু পরিমাণে ডাচ রক্ত মিশেছে, অর্থাৎ যেসব ডাচ সাহেব এদেশীয় রমণীকে আইনগতভাবে জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সন্তানরাই 'মিক্স্ড্ বা 'ইন্দো'। আর যাদের এই দেশ, এই দেশেরই মানুষ যারা, তারা হল ঘৃণ্য 'নেটিভ'। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষার অধিকার—এইসবই নির্ভর করত এই বিভাগের ওপর। এই বিভিন্ন বিভাগের জন্য দেশের আইনও ছিল ভিন্ন-ভিন্ন। যারা 'পিয়োর', খাঁটা চামড়ার মানুষ, তাঁদের জন্য বিশেষ বিচারালয়, বিশেষ বিচারক। অন্যদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা, পৃথক আইন। এ ছাড়া আরও একটি বর্গ তৈরি হয়েছিল—ডাচ প্রভুদের বদান্যতায়। একটা অলিখিত কানুন তৈরি হয়েছিল যার নির্লজ্জতার কোনো সীমা নেই।

এই দ্বীপপুঞ্জের রমণীরা অধিকাংশই সুন্দরী। বহু ডাচ ভাগ্যান্বেষণে এই দূরদেশে আসতেন স্ত্রীপুত্রপরিবার ছেড়ে। কিন্তু তাঁরা সবাই এদেশে এসে ভীষণের বনে যেতেন, এমন কথা ভাববার কোনো সংগত কারণ নেই। তাহলে এইসব শ্বেতাঙ্গপুরুষের উপায় কী? ক্ষমতা হাতে থাকলে উপায় পেতে বিলম্ব হয় না। অলিখিত আইন চালু হয়ে গেল—কোনো ডাচ ইচ্ছে করলেই যে-কোনো নেটিভ রমণীকে ছলে-বলে-কৌশলে অঙ্কশায়িনী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন। বিবাহ না করেও স্ত্রীর মতোই ব্যবহার করতে পারবেন তার সঙ্গে। সন্তান হতেও কোনো বাধা নেই। কিন্তু এই সন্তানদের মেনে নেওয়া বা না-নেওয়া শ্বেতাঙ্গ প্রভুর মর্জি। তিনি ইচ্ছে হলে তাঁর এইসব ছেলেমেয়েকে মেনে নিতে পারেন তাঁর অঙ্কশায়িনীকে মেনে না নিয়েও। অর্থাৎ, এদের বাপ থাকবে, কিন্তু মা বলে কিছু থাকবে না।

এই উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র এইরকম এক রমণী। আশ্চর্যের কথা, কোনোরকম আইন দিয়েই এদের জীবন সুরক্ষিত নয়, অথচ সামাজিক জীবনে এদের একটা স্থান অস্বীকার করা যায় না। সমাজে এঁরা নিয়াহ্ (nyai) বলে পরিচিত। নামের সঙ্গে এই নিয়াহ্ কথাটা জুড়েই সবাই এঁদের সম্বোধন করে। কথাটির অর্থ 'মহিলা' (লেডি), কিন্তু উনিশ আর বিশ শতকে শব্দটির অর্থ দাঁড়াল ডাচ ভদ্রলোকের স্থানীয় রক্ষিতা। নিয়াহ্ রাখলে কোনো ডাচ ভদ্রলোকের সামাজিকভাবে কোনো লজ্জার কারণ হত না, তাঁর চরিত্রেও কোনো কটাক্ষপাত হত না। নিয়াহ্ যতক্ষণ ডাচ প্রভুর নেকনজরে থাকতেন ততক্ষণ তাঁর পক্ষে দৈনন্দিন জীবনযাপনে কোনো অসুবিধা না থাকলেও, সাধারণ মানুষ কখনোই এঁদের সম্মানের চোখে দেখত না।

এই উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র এইরকম একটি নিয়াহ্—নাম নিয়াহ্ অনতোসোরো। অসাধারণ চরিত্র-বলে বলীয়ান, অদ্ভুত কর্মকুশল, বুদ্ধিদীপ্ত এই নারী দুটি সন্তানের জননী। সন্তানরা পিতার স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু নিয়াহ্য়ের কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই। সমস্ত উপন্যাসটা জুড়েই এই নারীর কর্মকাণ্ড। এঁর ব্যক্তিত্বের সামনে অনেক বিরুদ্ধ শক্তিই হতমান। কিন্তু যত বড় শক্তিমতী আর বুদ্ধিমতীই হোন না কেন, সমাজের আশ্রয়ে বঞ্চিতা এবং সাদা আইনের চোখে অপাঙ্‌ক্তেয় এক নিয়াহ্য়ের উদ্ধত মাথা একদিন হৃদয়হীন প্রবল রাজ-শক্তির সামনে ধুলোতে লুটবেই। সেই করুণ কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। কিন্তু ডাচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়। এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে শেষ কথা বলেছেন মাক্স লেন—

Pramoedya Ananta Toer set out to recreate the past through the telling of a story and the evocation of an atmosphere. He has recreated—no, he has actually brought to life in the first person—the real ego of his main character, a new historical personality in the process of being forged, by history itself. It is Minke, his psyche, his predicament, that is able to bring such a huge kaleidoscope of characters and stories together and engross the reader in the process. The figure of Minke himself in announcing the coming of something which would envelope everybody, which will leave no part of society free of turmoil : a revolutionary future, the awakening of people.

প্রসঙ্গত এখানে একটা কথা বলা দরকার। বাঙলা ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। সেই থেকে বাঙলায় বহু গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। অনেক শক্তিশালী লেখকেরও আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই উপন্যাসের মতো বই একখানাও লেখা হয় নি। সমগ্র জাতির সুখদুঃখ-আশা-নিরাশার কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে, এমন একখানা উপন্যাসও বাঙলা সাহিত্যে নেই। ব্যক্তির ভিতর দিয়ে সমষ্টিকে প্রকাশ করা এক অতি দুঃসাধ্য সাহিত্যকর্ম। সেই কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছেন লেখক এই উপন্যাসে। গ্রন্থটিকে ক্লাসিকধর্মী বললে কিছুমাত্র অতিকথন হবে না।

এত কথা বলার পর পাঠকদের মূল কাহিনীর একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

জাকারতার অন্তর্গত সুরাবাইয়া একটি পুরনো শহর। একটি বাণিজ্যিক বন্দরকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এই শহরটি। কাহিনী শুরু হচ্ছে উনিশ শতকের শেষ দশকে। সমৃদ্ধ এই শহরে বহু মানুষের বাস। বহু জাতিরও। বহু রকমের জীবিকা এই জনবহুল শহরে। ডাচদের বড়ো একটি চিনির কল আছে শহরপ্রান্তে। রেলগাড়ির বাস্ত স্টেশন আছে। নেই কেবল বিজলি বাতি। তখনও ইলেকট্রিক এসে পৌঁছয় নি। টেলিগ্রাফ সবে পদার্পণ করেছে।

এইখানেই বাস করত মাস্‌ত্রোমোটো। চিনিকলের নেটিভ কেরানি। নিজস্ব কিছু জমিজমা থাকায় তার অবস্থা সচ্ছল। তার সত্যিকারের সুন্দরী স্ত্রী ছিল। সেই কারণে আর দশজন জাভাবাসীর মতো দ্বিতীয় বার কোনো পত্নী গ্রহণ করে নি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। মেয়েটি অপূর্ব রূপসী। প্রতিবেশীরা সবাই তাকে বলত পদ্মফুল। তবু মাস্‌ত্রোমোটো সুখী ছিল না। একটা উচ্চ আশা তাকে শয়নে-স্বপনে ক্ষুরে-ক্ষুরে খেত। উচ্চাশাটি হল ওই চিনি-কোমপানির ক্যাশিয়ার হওয়া। তার ধারণায় ওই পদটি ভারি সম্মানের আর ওই পদটি পেলেই সে সুখের সাগরে ভাসবে। ওই পদটি পাবার জন্য সে কত রকম চেষ্টাই না করত! সব আত্মসম্মান খুইয়ে সাদা মানুষদের পায়ে প্রায় আত্মবলিদান দিত।

চিনিকলের সর্বেসর্বা হারমান মেল্লেমা। তাকে খুশি করবার জন্য কী প্রাণান্তকর চেষ্টাই না ছিল এই নেটিভ করণিকের। শেষ পর্যন্ত মানুষটা একটা ভয়ানক কাজ করে বসল। তার একমাত্র সুন্দরী কন্যাকে হারমান মোল্লেমার হাতে তুলে দিল বধূ হিসেবে নয়—রক্ষিতা হিসেবে। পঞ্চদশী কুমারী বাপের দুর্দমনীয় লোভের হাতে বলি হল। কুমারী থেকে 'নিয়াহ্' হয়ে হারমানের অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। রাগে দুঃখে অভিমানে তার কুমারী-হৃদয় দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। অবস্থাটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু যে বাপ তাকে বিক্রি করে দিল, যে মা তাকে রক্ষা করতে অক্ষম, তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চির-দিনের মতো সে ত্যাগ করল। সেই দিন থেকে কঠিনতর ধাতুতে তৈরি হল তার হৃদয়, তার চরিত্র।

হারমান ছিলেন উচ্চশিক্ষিত মানুষ। হৃদয়বানও বটে। ব্যবহারিক জীবনে কর্মকুশল। নিয়াহ্য়ের রূপ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। নিয়াহ্ও দিনে-দিনে তাঁর বিশ্বস্ত সচিবী হয়ে উঠল। কেবল নর্মসহচরী নয়, কর্ম-সহচরীও। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে হারমান শহরের শেষ প্রান্তে অনেক জমি, জঙ্গল কিনে বিরাট ব্যাবসার পত্তন করলেন। প্রকাণ্ড ফার্‌ম্ তৈরি হল। একদিকে বড়ো ধরনের চাষবাস, আর-এক দিকে দুগ্ধজাত দ্রব্য, হাঁসমুরগি পালন ইত্যাদি পণ্য উৎপন্ন হত এই প্রতিষ্ঠানে। নিয়াহ্ ধীরে-ধীরে ব্যাবসার সব-কিছুই শিখে নিল। অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিল সমস্ত কাজে। সেই সঙ্গে ডাচ ভাষা আর সাহিত্যে বুৎপত্তি লাভ করে এত বড়ো ব্যাবসার কর্ণধার হয়ে উঠল।

দুটি ছেলেমেয়ে হল তার। হারমান তার অনেক আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ করলেন, কিন্তু কিছুতেই বিয়ে করলেন না। চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে, নিজের সামাজিক অসহায়তার কথা ভেবে নিয়াহ্য়ের সঙ্গে মমতা বিষিয়ে উঠল। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো সবই তার, কিন্তু কিছুর উপরই তার অধিকার নেই। এমন-কি নিজের ছেলেমেয়ের উপরেও না। তার মাতৃত্বের কোনো আইনগত স্বীকৃতি নেই।

ব্যাবসার প্রয়োজন ছাড়া নিয়াহ্য়ের সঙ্গে বহির্জগতের কোনো যোগাযোগ নেই। তার বাড়িতেও কেউ কখনও আসে না, সেও কোথাও যায় না। তার একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠল তার রূপসী কন্যা অ্যান।

হঠাৎ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় হারমান তাঁর মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় আশ্রয় নিলেন কেউ জানল না। মাঝে-

মাঝে হঠাৎ এসে উপস্থিত হতেন বাড়িতে, সোজা চলে যেতেন নিজের ঘরে। তারপর আবার হঠাৎ কখন উধাও হয়ে যেতেন।

আর কেউ না জানলেও নিয়াই কিন্তু জানলেন কোথায় আস্তানা নিয়েছেন তাঁর অপ্রকৃতিস্থ প্রভু। কারণ প্রতি মাসের শেষেই তাঁর কাছে একখানা করে বিল আসত হারমানের বাবদ। নিঃশব্দে টাকা মিটিয়ে দিতেন নিয়াই। প্রভুর অপ্রকৃতিস্থতার কথা প্রকাশ করবার কোনো উপায় ছিল না। কারণ তাহলে সমস্ত ব্যাবসা, সব সম্পদ চলে যেত ডাচ সরকারের হাতে। তাঁর যে কোনো-কিছুতেই অধিকার নেই। তিনি যে একজন নেটিভ নিয়াই মাত্র!

এই সময়েই রঙ্গমঞ্চে উপ স্থিত হল এই কাহিনীর মূল নায়ক—মিংকে। মিংকে বু দ্ধিমান, ধীরগম্ভীর, সুদর্শন তরুণ। কিন্তু নেটিভ। এমন-কি ইন্দো-ও নয়। নেটিভ হলেও উচ্চবংশজাত। অর্থাৎ গত যুগের কোনো সুলতান বংশের রক্ত আছে তার ধমনীতে। সেই কারণেই সাদা মানুষদের কলেজে পড়বার সুযোগ হয়েছে। এক বছরের মধ্যেই গ্র্যাজুয়েট হয়ে বের হবে। স্বনামধন্য লেখক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ছাত্রাবস্থাতেই ডাচ কাগজে ছদ্মনামে তার লেখা প্রকাশিত হয়ে উচ্চশিক্ষিত মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইউরোপীয় ধারায় শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ খুব কম নেটিভের ভাগ্যেই ঘটেছে। ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের চিন্তা, নব-নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা, ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের মানবদরদী উদারনৈতিক চিন্তাধারা, মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসান—এ সবকিছুই মোহগ্রস্ত করেছে তাকে। তার আচরণে বাক্যে শিক্ষিত মার্জিত রুচির প্রকাশ। নিয়াইয়ের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে বিস্মিত, মুগ্ধ।

নিয়াইয়ের মতো অসাধারণ মহিলা সে কখনো দেখে নি। দেখে নি অ্যানের মতো অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী। সহজেই সে শ্রদ্ধাবান হল নিয়াইয়ের প্রতি আর ভালোবেসে ফেলল অ্যানকে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরিবারেরই একজন হয়ে উঠল মিংকে। নিয়াইকে যতই দেখে ততই শ্রদ্ধা বাড়ে। তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, সকলের সঙ্গে সহজ কিন্তু দূরত্বব্যঞ্জক ব্যবহার, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর আত্মমর্যাদাবোধ মিংকেকে মুগ্ধ করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে নিয়াইকে 'মা' বলে সম্বোধন করে। নিয়াইও তাকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে ফেলেন। নিয়াইয়ের সংস্পর্শে এসে মিংকের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নতুন দিগন্ত পায়, তার পৃথিবীর পরিধি যেন বেড়ে ওঠে।

আর অ্যান ওকে গ্রহণ করে নিকটতম আত্মীয়ের মতো। নির্ভর করতে চায় তার উপর সব রকমে। গৌরবে মিংকের প্রাণে আনন্দের স্রোত বয়। ধন্য মনে হয় নিজেকে। দিনে-দিনে প্রেমের অনুভূতি গভীরতর হয়।

নিয়াইয়ের আহ্বানে এবং অ্যানের আকর্ষণে মিংকে তার ক্ষুদ্র ভাড়াটে ঘরটি ছেড়ে ওঁদের বিলাসবহুল অট্টালিকায় উঠে আসে। সুন্দর সুসজ্জিত একটি ঘর দেওয়া হল তাকে। তার সেবাযত্নের দায়িত্ব নেয় অ্যান। আর একখানা গাড়ি আর কোচম্যান দেওয়া হয় তাকে রোজ শহরের বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার জন্য। তার ফলে সমস্ত বিদ্যালয়টি তার প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে। শহরের বহু মানুষও। মিংকে বিস্মিত হয়, কিন্তু সমস্ত প্রতিবন্ধকই সহজ মনে মেনে নেয়। তার যা-কিছু বিস্ময়, যা-কিছু অসন্তোষ প্রকাশ পায় তার লেখনীতে। অনবদ্য ডাচ ভাষায় তার লেখা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন কাগজে। ছদ্মনামের পরিচয়ে লেখক প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে হারমানের মৃতদেহ পাওয়া যায় তাদের বাড়ির অদূরে একটি চায়না প্লেজার হাউসে। সরকারের তরফ থেকে মেল্লেমা পরিবার এবং মিংকেকেও এই মামলায় জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা হয়। মিংকেকে জড়াবার চেষ্টা হয় এই বলে যে ওদের বিরাট ব্যাবসার লোভেই সে এই কুকর্মে জড়িত। এই নীচ মিথ্যা অপবাদে মিংকের সমস্ত মনপ্রাণ সংকুচিত হল। তারপর আদালতে মিংকে এবং অ্যানের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে বহু অর্থহীন বাদানুবাদ। হারমানের মৃত্যুর সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নয়, সেইসব কথা টেনে আনা হল শত-শত শ্রোতার সামনে। এমন-কি তারা কিভাবে রাত্রিযাপন করে, এ প্রশ্নও করা হল। কিন্তু প্লেজার হাউসের চীনা মালিক শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল যে হারমান গত পাঁচ বছর ধরে অর্থের বিনিময়ে তার কাছেই থাকত। তাকে সর্বক্ষণ সঙ্গ দিত প্লেজার হাউসের সর্বাপেক্ষা রূপসী রূপোপজীবিনী। তারপর কোনো কারণে দীর্ঘ কাল ধরে তার পানীয়ের সঙ্গে অতি অল্প পরিমাণে বিষ প্রয়োগ করা হত। তার ফলেই হারমানের মৃত্যু। নিয়াই আর মিংকে অব্যাহতি পেল। কিন্তু মিংকে ভাবল, এই কি সভ্যতা? সভ্যতার আবরণে এত নীচতা, এত নির্দয়তা? ইউরোপের কাছে কি এই সভ্যতাই আমাদের শিক্ষণীয়?

এই ঘটনার পরেই মিংকের সঙ্গে বিয়ে হল অ্যানের। সুখী হল দুজনেই। অনেক নিশ্চিন্ত হল নিয়াই। কিন্তু ইংরেজিতে একটি কথা আছে : ডু নট কল এ ম্যান হ্যাপি টিল হি ইজ ডেড।

হঠাৎ একদিন আমস্টার্ডামের উচ্চতম আদালতের ফরমান পৌছল সুরাবাইয়ার আদালতে। তার মর্ম এই : প্রয়াত হারমান মেল্লেমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকাংশই পাবে তার স্বাভাবিক পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মরিটাস। সামান্য অংশ পাবে তার আইনগতভাবে স্বীকৃত পুত্র এবং কন্যা। তার নিয়াই কিছুই পাবে না কারণ হারমানের সঙ্গে তার কোনো আইনগত সম্পর্ক নেই। যেহেতু পুত্র রবার্ট নিরুদ্দেশ এবং কন্যা অ্যান অপ্রাপ্তবয়স্কা, তাদের ভাগের সম্পত্তিও দেখাশোনা করবে স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী মরিটাস। অ্যান যেহেতু অপ্রাপ্তবয়স্কা, সেইহেতু কোর্ট মরিটাসকেই সর্বতোভাবেই তার অভিভাবক নিযুক্ত করল।

এই আদেশকে প্রতিহত করার জন্য নিয়াই আর মিংকে যখন প্রাণপণ প্রয়াসী ঠিক তখনই আর-এক হুকুমনামায় জানানো হল—পাঁচ দিনের মধ্যে অ্যানকে সুরাবাইয়া ত্যাগ করে হল্যান্ডগামী জাহাজে উঠতে হবে, যেতে হবে তার অভিভাবক মরিটাসের কাছে।

মিংকে বলল, 'আমার বিবাহিত স্ত্রীকে নেবে কেমন করে? আমার ধর্ম ইসলাম। সেখানে অপ্রাপ্তবয়স্কতার কোনো প্রশ্ন নেই। মুসলমান মতে বিয়ে হয়েছে আমাদের।'

সুরাবাইয়ার জজ মৃদু হেসে বললেন, 'এ বিয়ে বিয়েই নয়। অ্যানের কোনো বিয়েই হয় নি। বরং যাদের প্ররোচনায় এই মিলন হয়েছে তারা দায়রার সোপর্দ হবে বলাৎকারের প্রশ্রয়দাতা হিসেবে।'

মিংকে নিয়াইকে জানাল, এমন অন্যায় অত্যাচার মেনে নেওয়া অসম্ভব। যুদ্ধ করতে হবে এই হুকুমনামার বিরুদ্ধে।

নিয়াই বলল, যুদ্ধ করতে হবে নিশ্চয়ই, তবে একটা কথা প্রথম থেকেই মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এ যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত।

বহু চেষ্টার পর পরাজয়ই মানতে হল। সরকারের লোক এসে অ্যানকে নিয়ে গেল জাহাজে। নির্বাক অ্যান ধীর পদক্ষেপে বিদায় নিল।

এই হল ইউরোপের সভ্যতা, উদার মানবিকতা, বিজ্ঞানের দান। ভাবছিল মিংকে।

অনিরুদ্ধ চৌধুরী

কমনওয়েলথ : কোথা থেকে কোথায়

লনডনে শীতের প্রকোপ বড়ো বেশি। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমক ইতিহাসবিদ ট্যাসিটাসের মতে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের আবহাওয়া "জঘন্য"। সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লী কুয়ান ইউ আগেও তা নিয়ে অনুযোগ করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, এবার কমনওয়েলথ সম্মেলন সিঙ্গাপুরে হোক। পুরোনস্তর কমনওয়েলথ সম্মেলন সেই প্রথম বসল লনডনের বাইরে।

কমনওয়েলথের সেই ১৯৭১-এর সম্মেলন নানা দিক থেকে স্মরণীয়, কিন্তু এই ঘটনাটির তাৎপর্যও বড়ো কম নয়। কোথায় লনডন, মহতো মহীয়ান, কোথায় সুদূর সিঙ্গাপুর। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, এই কলকাতাতেই কোনো এক আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় অসট্রেলিয়া, নিউজীল্যানড ইত্যাদি দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে একজন ইংরেজ সবে বলতে আরম্ভ করেছেন—'আপনারা যারা পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে এসেছেন···', সঙ্গে-সঙ্গে 'প্রত্যন্তবাসী'দের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের চোখে আপনারাই এসেছেন প্রত্যন্তসীমা থেকে, আসি নি,' কাজে-কাজেই ভূগোলের অভিধান থেকে 'নিকটপ্রাচ্য', 'দূরপ্রাচ্য' ইত্যাদি শব্দ বাদ পড়ে যাচ্ছে। একদা মানুষ যেমন ভাবত, তার নিজস্ব এই পৃথিবী-নামক নগণ্য গ্রহটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র, তেমনি কোনো-কোনো দেশের মানুষ ভাবত, পৃথিবীর সারকাসের তারাই রিং-মাসটার।

অবশ্য ব্রিটেনের পক্ষে তেমন ভাবনা এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে খুব অন্যায় ছিল না। ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি একটি দেশ। ১৯১১ সালে সেই দেশের রাজা পঞ্চম জর্জের যখন রাজ্যাভিষেক হল, তখন তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের সম্রাট। সে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। ১৯১৪ সালে ব্রিটেনের লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চার কোটির কম, কিন্তু সে বছর ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করল সেই সংখ্যার দশগুণ, ৪৫ কোটি লোকের পক্ষ থেকে। একা ভারতই দিল আট লক্ষ সৈন্য। বিশ্বজোড়া সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল প্রায় তিনশ বছর ধরে। কী করে গড়ে উঠল? স্বনামধন্য পণ্ডিত ধর্মযাজক ইং বলেছিলেন, 'সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইংরেজ পরিশ্রমীও নয়, হিসেবিও নয়; আলস্য, ব্যয়বাহুল্য এবং বিলাসব্যসনের দিকে তাঁর ঝোঁক।' নেহাত ভৌগোলিক অবস্থানটা সুবিধাজনক ছিল, ইউরোপীয় রাজনৈতিক চক্রে স্পেন, হল্যানড এবং ফ্রান্সের মতো জড়িয়ে পড়ে নি, কয়লা ছিল, লোহা ছিল, এবং ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন ছিলেন, তাই, ইংরেজ মতে, ইংরেজদের "আজ এই বাড়বাড়ন্ত, আমরা বৃহৎ শক্তি।' তাই বলে, "কখন অন্যমনে" যে এত বড়ো একটা সাম্রাজ্য আমরা জুটিয়ে ফেলেছি, তাও নয়। 'বাণিজ্যের প্রয়োজনে, বাণিজ্যিক পথ সুরক্ষার প্রয়োজনে, সাময়িক প্রয়োজনে, যাদের সঙ্গে যখন রেষারেষি হয়েছে তাদের ওপর টেক্কা দেবার তাগিদে, ইত্যাদি কারণে এই সাম্রাজ্যের অনেকটাই আমাদের জয় করে নিতে হয়েছে।' তবে, ইং বলেছেন, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোনো গভীর পরিকল্পনাও তাঁর দেশের ছিল না। 'সাধারণত বাণিজ্যের পিছু-পিছু আমাদের পতাকা গিয়েছে, পতাকার পিছু-পিছু বাণিজ্য এগোয় নি।'

দেশে বিদেশে

সে যাই হোক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯১৯-এর জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ পূর্ব গৌরবে যে দলটির নেতা হিসাবে ভারসাই গেলেন পরাজিত জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তিসম্পাদনের উদ্দেশ্যে, তাতে ছিলেন আরও চারটি দেশের চারজন প্রধানমন্ত্রী—অসট্রেলিয়ার, কানাডার, নিউজীল্যানডের এবং দি ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এঁরা চারজন প্রতিনিধি। বিদেশী পর্যবেক্ষকদের কেউ-কেউ বললেন, এ শুধু ব্রিটেনের চালাকি, নিজের পক্ষে ভোট বাড়াবার ফন্দি। সাধে কি বলে, ধুরন্ধর ইংরেজ, "দ্য পারফিডিয়স ব্রিটেন"? আসলে ব্রিটেনের সঙ্গে তার মালিকানাভুক্ত দেশগুলির সম্পর্ক ইতিমধ্যে বদলাতে আরম্ভ করেছে। এইসব দেশ একদা ব্রিটেনই শাসন করত, কিন্তু ১৯১৯-এ ঠিক হল, তাদের নিজেদের কথা নিজেদেরকেই বলতে দেওয়া উচিত। সে অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা অসমীচীন। পরে লীগ অব নেশনস-এও তারা সভ্যপদ পায়। এমন-কি ভারতও তার সভ্য হয়েছিল, যদিও ভারত তখনও ডমিনিয়নের মর্যাদা পায় নি।

সর্বপ্রথম ডমিনিয়ন বলে স্বীকৃতি পায় কানাডা। ১৮৬৭

সালের ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনে তাকে স্ব-শাসনের অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের নয়। ১৯১৪ সালের মধ্যে সে-অধিকার লাভ করে অসট্রেলিয়া, নিউজীল্যানড এবং দক্ষিণ আফ্রিকাও, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক বৃহৎ অংশের রূপান্তর ঘটে ব্রিটেনের সদিচ্ছা-সহযোগেই। আমাদের মতো ওরাও স্বসত্তা, শ্বেতকায়, অতএব আমাদের মতো ওরাও অবশ্যই নিজেদের দেশ নিজেরা শাসন করতে সক্ষম। হোয়াইট ম্যান কেন হোয়াইট ম্যানের ভার হবে? অতএব ব্রিটেন, এবং কতকাংশে আমেরিকার অনুকরণে কানাডায় তার নিজস্ব গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গঠিত হল, অন্য তিনটি দেশও তার অনুসরণ করল। তাদের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ রহিত হল, যদিও ব্রিটেনের রাজাকে তারাও রাজা বলে মানতে থাকল। প্রত্যেক দেশের থাকল নিজস্ব প্রধানমন্ত্রী, এবং সংসদীয় সরকার। প্রথমে এইরকম ব্যবস্থার তেমন কোনো জুতসই নাম পাওয়া গেল না। একে বলা হল "কানাডার মতো"। পরে এর নাম দেওয়া হল "ডমিনিয়ন স্টেটাস"। "এমপায়ার" শব্দটিও অনেকের মনে হল আপত্তিজনক। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী জান স্মাটস বললেন, তাঁর পছন্দ "ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস"—এই নাম।

যেমন নামে তেমনি চরিত্রেও পরিবর্তন এক দিনে আসে নি, কোনো-একটা পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী আসে নি—যেন পথ চলতে-চলতে আপনার নিয়মেই এসেছে। বছরের পর বছর "এমপায়ার" নামটি ব্যবহৃত হয়েই চলল; যাঁরা কমনওয়েলথ বলেন তাঁরাই আবার কখনও হয়তো "এমপায়ার" বলেন। এই অবস্থা চলল অনেক দিন। ওদিকে আবার স্বশাসিত ডমিনিয়নগুলির বৈদেশিক নীতি বলে আলাদা কিছু থাকবে না—এ ব্যবস্থা যে অবাস্তব, তাও ক্রমশ, যেন ঘটনার নিজস্ব নিয়মেই প্রকট হতে লাগল। তুরস্কের মুস্তাফা কামাল ব্রিটিশ সৈন্যদের একটি ঘাঁটির ওপর আক্রমণ করবেন, এইরকম সম্ভাবনা দেখে লয়েড জর্জ যখন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভয় দেখালেন, কানাডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা বিশেষ জোর দিয়ে বলল, তারা যুদ্ধ করবে কিনা সে সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই নেবে। তাছাড়া, কানাডা দাবি করল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের রাষ্ট্রদূত পাঠাবে। ১৯২৬ সালের ইমপিরিয়াল কনফারেন্সে কানাডার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেনজি কিং-এর উদ্যোগে এই বৈদেশিক-নীতি-ঘটিত সমস্যা নিয়ে আলোচনার পর বালফার-ফরমুলা গৃহীত হল। এই সূত্র অনুযায়ী ডমিনিয়নগুলি হবে:

Autonomous communiti.s within the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the Crown and freely associated as members of British Commonwealth of Nations.

আসলে, এই ফরমুলার যা বক্তব্য, বাস্তবতার দাবিতে ঘটনাস্রোত সেখানে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল, সূত্রাকারে এবার সেটা গ্রথিত হল, এই মাত্র। ইতিমধ্যে, সেই একই নিয়মে পরিবর্তন এগিয়েই চলেছে, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় সেক্রেটারি অব কলোনিজ ছাড়া আলাদা একটি পদ তৈরি হল—সেক্রেটারি অব ডমিনিয়নস। ব্রিটিশ রাজমুকুটের প্রতিভূস্বরূপ যে গবর্নর-জেনারেল প্রতি ডমিনিয়নে থাকেন, আগে যাঁকে ব্রিটেন থেকেই নিযুক্ত করে পাঠানো হত, ঠিক হল, তাঁর নির্বাচন সেই ডমিনিয়নই করবে। ১৯৩১ সনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের সরকার বালফার সূত্রটিকে আইনে পরিণত করল। তার নাম হল স্ট্যাটিউট অব ওয়েসটমিনিসটার। ইতিমধ্যে ডমিনিয়নের সংখ্যা চার থেকে বেড়ে হয়েছে ছয়। নতুন আইনটিতে সেগুলির নাম লিপিবদ্ধ হল—

The Dominion of Canada, the Commonwealth of Australia, the Dominion of New-Zealand, the Union of South Africa, the Irish Free State and Newfoundland.

বলা যেতে পারে, এই স্ট্যাটিউটটিই এখনকার কমনওয়েলথের মৌল আইন, যদিও দেশের নামের তালিকায় রদবদল হয়েছে। রদবদল বলতে তিনটি নামের বিয়োগ আর তার প্রায় ১৫ গুণ নামের যোগ।

তালিকা থেকে যে তিনটি নাম মুছে গেল, তার মধ্যে একটি, আইরিশ ফ্রী স্টেট-এর নাম একরকম জোর করেই ঢোকানো হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর শুধু ব্রিটিশ শাসন নয়, ব্রিটিশ সম্রাজ্য ত্যাগ করার ইচ্ছা সেদেশে প্রবল ছিল। তা ছাড়া, নব্যদারুন আয়ারল্যানডের বিচ্ছিন্নতা স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্রের দেহে

কাঁটায় মতো বিঁধে ছিল। ১৯৩৭ সালে সেদেশের জন্য নতুন সংবিধান অনুমোদিত হল, নতুন নামকরণ হল তার "এয়ারা", ব্রিটিশ রাজমুকুটের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকল নামে মাত্র, এবং নামে না হলেও কাজে এয়ারা রিপাবলিক হয়েই দাঁড়াল। তারপর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এয়ারা যখন যোগ দিতে অস্বীকার করল, তখন কমনওয়েলথে তার সদস্য হয়ে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়ল। ১৯৪ সালে এয়ারা সরকারিভাবে কমনওয়েলথ ত্যাগ করল।

নিউফাউনডল্যানডের 'কেস'টা একদম উলটো। স্বেচ্ছায়, নিজেরা ভোট দিয়ে, সেদেশ ১৯৪৯ সালে কানাডার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার একটি প্রদেশে পরিণত হল।

আর দক্ষিণ আফ্রিকা? সেদেশের সঙ্গে কমনওয়েলথের সম্পর্ক যেমন দীর্ঘ তেমনি বেদনাদায়ক। প্রথম থেকেই তার মধ্যে অনেক জটিলতা ছিল। সে জটিলতা দিন-দিন বেড়েছে বই কমে নি। প্রথম আমলের কমনওয়েলথে এই একটি দেশ ছিল যেখানে অধিবাসীদের অধিকাংশ—শতকরা প্রায় আশিজন—অশ্বেতকায়, এবং যে শ্বেতাঙ্গরা দেশের শাসক, তারও অধিকাংশ অ-ব্রিটিশ, ডাচ-বংশোদ্ভূত বোয়ার-জাতীয়। ব্রিটিশ যারা, তারা ব্রিটেনের সঙ্গে একটা যোগসূত্র বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল, আর বোয়ারদের মধ্যে অনেকেরই আগ্রহের অভাব ছিল সে বিষয়ে। কিন্তু এই বোয়ারদেরই একজন আবার ছিলেন ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস-এর অগ্রগণ্য সমর্থকদের একজন। জান স্মাটস শুধু বোয়ারই ছিলেন না, বোয়ার যুদ্ধে একজন নেতৃস্থানীয় সৈনিকও ছিলেন। পরে তিনিই ব্রিটেনের পরম সুহৃদ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ বলে পরিগণিত হন।

তাঁর দেশের ভিতরে কিন্তু মাথাব্যথাটা ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কমনওয়েলথে অংশীদারিত্বাদি বিষয় নিয়ে ততটা নয়, যতটা স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের সম্পর্কে কী নীতি সঠিক, তাই নিয়ে। প্রধান ভাবনা ছিল, শ্বেতকায়-দের বিশেষ অধিকারগুলি বজায় থাকবে কিনা, তাই নিয়ে। স্মাটসের নামে "বদনাম" রটতে আরম্ভ করেছিল যে তিনি অশ্বেতকায়দের চাপের মুখে নতিস্বীকার করতে চলেছেন। অবশ্য ১৯১৫ সালে স্মাটস দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়-দের দাবি, গান্ধীর চাপে পড়ে, কিছু-কিছু মেনে নিয়ে-ছিলেন, এবং তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ন্যাশনালিস্ট পার্টির তুলনায় অশ্বেতকায়দের প্রতি তাঁর নীতি খানিকটা কম কঠোর ছিল। কিন্তু তাই বলে কৃষ্ণাঙ্গ "কাফির"দের অতি-রিক্ত আশকারা দিয়ে তিনি মাথায় তুলবেন, এ ছিল মিথ্যা অপবাদ। ভারত কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ করে তখন স্মাটস তাতে আপত্তি জানান। ক্ষমতাচ্যুত হবার পরও তিনি কমনওয়েলথের মস্ত বড়ো গুণগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু সরকারের বর্ণবাদী নীতির বিরুদ্ধাচরণ কখনও করেন নি। পরবর্তী কালে দেখা গেল, সেই মানবতা-বিরোধী নীতি কমনওয়েলথের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্যাশনালিস্ট পার্টি ১৯৪৭ সালে সরকারিভাবে আপার্টহাইট নীতি গ্রহণ করে, কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই সেদেশে বর্ণবৈষম্যের নীতি নানা-ভাবে প্রযুক্ত হয়ে আসছে। স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ বান্টু-রা সংখ্যায় শ্বেতকায়দের চতুর্গুণ, কিন্তু তাদের উপর নিষেধা-বিধি চাপানো রয়েছে, এবং শাসনক্ষমতায় যে তাদের ভাগ বসাতে দেওয়া হবে না, সে বিষয়ে শ্বেতাঙ্গরা দৃঢ়সংকল্প। ১৯৩৯ সালে আবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে স্মাটস শুধু সেসব নিষেধবিধি বজায় রাখলেন, তাই নয়, জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন—সেই নীতিই যুক্তিযুক্ত, সঠিক। এত করেও ১৯৪৮-এর নির্বাচনে তিনি হেরে গেলেন, এমন-কি সংসদে তাঁর আসনটিও হারালেন। দু বছর পরে তাঁর মৃত্যু হলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পাদনের প্রস্তাব তাঁর পরিবার প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁরা শুধু যে প্রধানমন্ত্রী ড. মালানের সরকারের উগ্র বর্ণবাদী নীতিরই নিন্দা করলেন তাই নয়, তার চেয়ে জোরালো আপত্তি জানালেন কমনওয়েলথ-বিরোধী মনোভাবের সম্পর্কে।

তারপর যত সরকার বদল হয়, বর্ণবাদী নীতি কঠোর থেকে কঠোরতর রূপ গ্রহণ করে। ১৯৬০ হিংসা এবং রক্ত-ক্ষয়ের বছর। সে বছর মার্চ মাসে জোহানেসবার্গের কুড়ি মাইল দক্ষিণে শার্পভিলে কয়েক হাজার আফ্রিকীয় কৃষ্ণাঙ্গ বিক্ষোভ-প্রদর্শনের সময় পুলিসের গুলিতে এবং জেট-বিমানের আক্রমণে ৬৭ জনের মৃত্যু হল, জখম হলেন প্রায় ২০০। খবরের কাগজে সেই নৃশংসতার ফোটো ছাপা হল, সারা পৃথিবী এবং কমনওয়েলথ-ভুক্ত যত দেশ ছি-ছি করতে লাগল। স্পষ্ট হয়ে উঠল, এরপর কমনওয়েলথে দক্ষিণ আফ্রিকার ঠাঁই আর থাকা উচিত নয়। শার্পভিলের ঘটনার আগেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান

কেপটাউনে এক বক্তৃতায় বর্ণবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা করলেন এবং বললেন,

The most striking of all the impressions I have formed since I left London a month ago is the strength of···Africa national consciousness. In different places it may take different forms, but it is happening everywhere. The wind of change is blowing through the continent. Whether we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact. Our national policies must take note of it.

ব্রিটেনের পক্ষে অবশ্য কিছু-কিছু অসুবিধাও ছিল। তার লাভজনক বাণিজ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে, তার নৌবহরকে সাহায্য করবার জন্যে সেদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল সুবিধাজনক। তবু ম্যাকমিলানের "পরি-বর্তনের হাওয়া" বক্তৃতার পরে বোঝা গেল, কমনওয়েলথে দক্ষিণ আফ্রিকার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

১৯৬০ সালেই কমনওয়েলথ নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান দক্ষিণ আফ্রিকার সদস্যপদ-সংক্রান্ত প্রশ্নটি তুললেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষ থেকে জানানো হল, আপার্টহাইট নিয়ে কমনওয়েলথের মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। আরও জানানো হল, কমনওয়েলথে থাকা না-থাকা নিয়ে সেদেশে গণভোট নেওয়া হবে। সম্মেলনের শেষে প্রকাশিত বিবরণীতে বলা হল, দক্ষিণ আফ্রিকা ইচ্ছা করলে প্রজাতন্ত্র হতে পারে, কিন্তু তাহলে সদস্যতর জন্য আবেদন করতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘোষণা করা হল: The Commonwealth is a multiracial association।

দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ ত্যাগ করল।

ইতিমধ্যে "পরিবর্তন"-এর হাওয়া ঝড়ের বেগে বইতে শুরু করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলি একের পর এক স্বাধীন হয়ে কমনওয়েলথে যোগ দিয়েছে। যে সংস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল গুটিকয় শ্বেতকায়-অধ্যুষিত অথবা শ্বেতকায়-শাসিত রাষ্ট্রের ক্লাব হিসেবে, তাতে শ্বেতকায়রা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৯৫০ সালে ভারত যখন প্রজাতন্ত্র হল, তখন দেখা গেল সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনও হজম করতে কমনওয়েলথ সমর্থ। ব্রিটেনের রাজার প্রতি ভারতের আনুগত্যের প্রশ্ন আর থাকল না, কিন্তু কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের মতো ভারতও ব্রিটেনের রাজাকে কমনওয়েলথের প্রধান বলে স্বীকার করে নিল।

এবার ফিরে যাই ১৯৭১-এর সেই ঐতিহাসিক কমন-ওয়েলথ সম্মেলনে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড হীথ বদ্ধপরিকর—দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র সরবরাহ করবেনই, কেননা ১৯৫৭ সালে সম্পাদিত সাইমনসটাউন চুক্তি অনুযায়ী সে বিষয়ে ব্রিটেনের একটা বাধ্যবাধকতা ছিল। হীথ দাবি করলেন, কমনওয়েলথের অন্য যে-কোনো দেশের মতো ব্রিটেনও তার নিজস্ব নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীন, এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র সরবরাহ করাও সেই নীতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কমনওয়েলথের সামনে এক সংকট উপস্থিত—অধিকাংশ সদস্য ব্রিটেনের সে নীতির বিরোধী। কতকটা সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লী কুয়ান ইউয়ের চেষ্টাতেই সে সংকট তখনকার মতো এড়ানো গেল বটে, কিন্তু সবাই বুঝল, দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত ব্রিটিশ নীতি বারে-বারে কমনওয়েলথের সামনে ফিরে আসবে, সাইমনসটাউন চুক্তির যুক্তিও কমনওয়েলথের অধিকাংশ সদস্যের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং (ব্রিটেনের আরেকটি যুক্তি) ভারত মহাসাগরে রুশ নৌবহর যে বিপদের সৃষ্টি করতে পারে, এবং তার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যে অস্ত্র-সজ্জিত করা দরকার, তাও তারা মানবে না। এদিকে প্রধানমন্ত্রী হীথ এবং তাঁর বিদেশ-সচিব ডগলাস-হিউম সমানে আপার্টহাইটের নিন্দা করে চলেছেন। কিন্তু শুধু মুখের কথায় কী কাজ হবে?

আবার সেই সম্মেলনেই সদস্যরা গ্রহণ করল, যাকে বলা যায় তাদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দলিল, কমন-ওয়েলথ নীতির ঘোষণা—

The Commonwealth of Nations is a voluntary association of independent sovereign states, each responsible for its own policies, consulting and co-operating in the common interests of their peoples and in the promotion of international understanding and world peace.

Members of the Commonwealth come from territories in the six continents and five oceans, includes peoples of different races, languages and religions, and displays every stage of

economic development from poor developing nations to wealthy industrialized nations. They compass a rich variety of cultures, traditions and institutions.

Membership of the Commonwealth is compatible with the freedom of member Governments to be non-aligend or to belong to any other grouping, association or allowance. Within the diversity all members of the Commonwealth hold certain principles in common. That the Commonwealth can continue to influence international society for the benefit of the mankind.

* * *

We believe in the liberty of the individuals, in equal rights for all citizens regardless of race, colour, creed or political belief...

We recognize racial prejudice as a dangerous sickness threatening the healthy development of the human race and racial discrimination as an an unmitigated evil of society. Each of us will vigorously combat this evil within our own nation.

No country will afford to regimes which practice racial discrimination assistance which in its own judgement directly contribute to the pusuit or consolidation of this evil policy...

অর্থাৎ, আজকের কমনওয়েলথ তার ব্রিটিশত্বের পরিচয় ত্যাগ করে এত দূর এগিয়ে এসেছে যে তাকে এমন কোনো সংজ্ঞা দিয়ে সীমিত করা প্রায় অসম্ভব যাকে বিশ্বজনীন কোনো লক্ষ্য অথবা আদর্শ থেকে আলাদা করা যায়। তবু, কিছু-কিছু নীতি অথবা বিশ্বাস সে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে, যার প্রতি আনুগত্যের অভাব, কমনওয়েলথের যাকে বলা যায় নৈতিক ভিত্তি, তাকে আঘাত করতে বাধ্য। যেমন, বর্ণভেদবাদ-বিরোধিতা।

গত বছরের অকটোবরে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের নাসাউয়ে সম্মিলিত হয়ে ৫০টি কমনওয়েলথ দেশের সরকারের প্রধানগণ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশেষ-বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কঠোরতর ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিলেন অনেকে, কিন্তু ব্রিটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে তাতে সম্মত হবেন না, সে বিষয়ে যখন কোনো সন্দেহ থাকল না, তখন কতকটা মধ্যপন্থাই অবলম্বন করতে হল। নিষিদ্ধ হল দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনো সরকারি ঋণ দান, সেদেশে পারমাণবিক সরঞ্জাম রপ্তানি, পেট্রলিয়ম রপ্তানি ইত্যাদি। ধিক্কৃত হল নামিবিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার দখলদারি, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তার হামলা। দাবি করা হল নেলসন ম্যানডেলার, এবং অন্যান্য আপার্টহাইট-বিরোধীদের মুক্তি, রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রবর্তন। কমনওয়েলথের সাত সদস্যের এক "এমিনেন্ট পারসন্স গ্রুপ" নিযুক্ত হল দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সঙ্গে বিরোধী-পক্ষীয় রাজনীতিকদের কথোপকথনের পথ সুগম করবার জন্যে।

এই চেষ্টা ব্যর্থ বলে যখন পরিত্যক্ত হল, তখন ওই গ্রুপ তাঁদের সর্বশেষ রিপোর্টে জানালেন, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যাপক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা নিতেই হবে। না হলে, এমন রক্তপাত ঘটবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যা আর দেখা যায় নি। শেষ অবধি ব্রিটেন পর্যন্ত বলতে বাধ্য হল, এ বিষয়ে আরেকটু এগোতে সে রাজি আছে, যদি অবশ্য প্রধান-প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলি এবং ইউরোপীয় ইকনমিক কমিশন এবং কমনওয়েলথ সে বিষয়ে একমত হয়।

এই তো গেল বর্ণভেদবাদনীতির বিরোধিতার কথা। তা ছাড়া, ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা আছে, সমানাধিকারের কথা আছে। কমনওয়েলথের মধ্যেই সব দেশে যে এগুলি সমাদৃত, তা বলা যায় না। এ নিয়ে একবার প্রবল আপত্তি ওঠে উগানডার সম্পর্কে। ১৯৭৭-এর কমনওয়েলথ সম্মেলনে সেদেশের প্রেসিডেন্ট ইডি আমিন উপস্থিত হতে পারেন নি। ব্যাপক নির্যাতন, নিপীড়ন, গণহত্যা ইত্যাদির অভিযোগ তাঁর নামে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। ফলে সম্মেলনে উগানডার জন্যে সংরক্ষিত আসনটি খালিই থেকে যায়। তাঁর সরকারকে নিন্দা করে একটি বিবৃতি সম্মেলনে গৃহীত হয়, যদিও তাতে আমিনের নাম উল্লেখ করা হয় নি।

কমনওয়েলথের বর্তমান সেক্রেটারি-জেনারেল রামফল এক সাক্ষাৎকারের সময়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'যথার্থ মানবিক অধিকারসমূহের এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষায় কমনওয়েলথ যে অঙ্গীকারবদ্ধ, ওই সম্মেলনে তাই প্রমাণিত

হল।' তিনি আরও বলেন,

'It also helped to dissolve what I regard as a myth that national sovereignty is some kind of shield behind which every unspeakable horror can take place with impunity with the rest of international behaving as if it were not taking place at all—the notion that it is bad form, particularly among friends and within an association of nations.···The reflection can have long term effects for the Commonwealth.

শুধু বর্ণভেদবাদ-বিরোধিতাই নয়, কমনওয়েলথকে তার অন্যান্য মৌলিক নীতি সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে—যদি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তার ভূমিকার মর্যাদা সে রক্ষা করতে চায়।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জানুয়ারি ১৯৮৭ সংখ্যার
প্রথম প্রবন্ধ

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি—ভারতের বর্তমান অবস্থা

অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বর্তমানে ইউ-জি-সি সেনটার অব অ্যাডভানসড স্টাডিজ অন ন্যাশনাল প্রডাকটস, রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং খড়্গপুরের ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির পোসট-হারভেসট টেকনোলজি—এই দুই সংস্থার উপদেষ্টা)

একালের চোখে সেকালের জমিদার

১৮৭৩ থেকে ১৯৮৬—একশো বছরে একটি দেশের লিখিত ইতিহাসের কলেবর-বৃদ্ধি হয় অনেকখানি। কিন্তু সেই দেশের মানুষের রোজনামচায় কতখানি ছাপ পড়ে তার? দেশের অধিকাংশ মানুষ—নেতারা যাদের বলেন 'সাধারণ মানুষ'—তাদের ইতিহাস লিখতে কিন্তু বেশি পাতা লাগবার সম্ভাবনা নেই। তাদের গল্পটা মোটামুটি সেই একই রকম রয়ে গেছে, এমনি একটা চিন্তা থেকেই বুঝি গড়ে ওঠে বাংলাদেশের 'থিয়েটার' দলের ১৮৭৩ সালের 'জমীদারদর্পণ' নাটকটিকে মঞ্চস্থ করার তাগিদ। মীর মশার্‌রফ হোসেনের এই নাটকরূপী ঐতিহাসিক দলিলটিকে নবরূপ দিয়েছেন মমতাজউদ্‌দীন আহমদ। আহমদ সাহেবের বক্তব্য, 'জমীদারদর্পণ' মঞ্চগুণের জন্য নয়, বিষয়গুণের জন্যই আজো বেঁচে আছে।'

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে বাঙলার কৃষকের উপর জমিদারবর্গের অমানুষিক নির্যাতনের বিশ্বস্ত দলিল এই নাটক। মীর মশার্‌রফ হোসেন নিজে ছিলেন জমিদার। তাই জমিদারের চরিত্রচিত্রণ তাঁর পক্ষে একই সঙ্গে যেমন সহজ তেমনিই কঠিন কাজ ছিল। নিজের শ্রেণীগত অবস্থানের কথা চিন্তা করেই নাটকের নামকরণে তিনি "দর্পণ" শব্দটি ব্যবহার করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নাটকের মুখ্য অংশ জুড়ে রয়েছে তদানীন্তন জমিদারকুলের চরিত্রচিত্রণ এবং চরিত্রবিশ্লেষণ। নির্যাতিত কৃষক-চরিত্রগুলি এক্ষেত্রে এসেছে পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে। মমতাজউদ্‌দীন আহমদের নবরূপায়ণে অত্যাচারিত কৃষক আবু মোল্লাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার উত্তরণের কাহিনীই নাটকের বিষয়। মমতাজউদ্দীন বলেছেন, 'আমার নাট্যায়নে আবু মোল্লা বিষাদসিন্ধুর নায়ক নয়—বিদ্রোহী যমুনার কণ্ঠস্বর। এ পরিবর্তনের সাহসটি বিষয়গত নয়, বিশ্লেষণগত।···আমি একালের ক্রোধ ও বিদ্রোহী সত্তাকে সংযুক্ত করেছি মাত্র।' এই ব্যাখ্যাটি যথেষ্টই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু প্রযোজনটি দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে, কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভর বদল হওয়ায় নাটকটিতে একটি অন্য মাত্রা যুক্ত হয়েছে ঠিকই—কিন্তু সে মাত্রা মূলের উপর বাড়তি নয়, মূলের মাত্রা থেকে আলাদা এক মাত্রা। যদিও নাট্যরূপান্তরের ইতিহাসে এ ধরনের স্বাধীনতাগ্রহণ সাধারণ ঘটনা, তবুও বলতেই হয় 'বাংলার কৃষকবিদ্রোহের সোয়াশ' বছরের ইতিহাসের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আহমদ সাহেব কৃষক আবু মোল্লাকে যে সুস্পষ্ট শ্রেণীচেতনের অধিকারী হিসাবে গড়েছেন, তাতে ১৮৭৩ সালের গ্রামবাঙলার ইতিহাস কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কৃষকচরিত্রচিত্রণ খানিকটা অনৈতিহাসিক হলেও রূপান্তরটি সার্থক এবং প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে জমিদারের চরিত্রবিশ্লেষণে। মূলের জমিদার ছিল নারীমাংসলোলুপ, ভোগী। রূপান্তরে জমিদার শোষক—মূলত কৃষকের জমি আর শ্রমের প্রতি আর তার দৃষ্টি, সে রাজনীতিবিদ। এই ব্যাখ্যাটি বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এখনো পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে শোষণ অত্যাচারের শেষ এবং চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে নারীর সতীত্বনাশ। প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্যেও কোনো অজ্ঞাত কারণে এখনো শ্রমের চোরাকারবার, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির ঘুঁটি চালানো সব তুচ্ছ হয়ে যায় নারীধর্ষণের ঘটনার কাছে। যেন ধর্ষণ ছাড়া অন্যরূপ শোষণ নারীকে স্পর্শ করে না, মানুষের চরম উত্তরণ অপেক্ষা করে থাকে তার স্ত্রীর শেষ সম্পদ সতীত্ব হারানোর জন্য। আমাদের সাহিত্যে এখনো ধর্ষণকারী না হলে একটি চরিত্রের ভিলেন হিসেবে যোগ্যতা কমে যায়। এ অবস্থায়

নাটক

মমতাজউদ্‌দীন তার রূপান্তরে ধর্ষণের ঘটনাটিকে উপলক্ষ মাত্র করে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

এমন বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রচিত্রণ সত্ত্বেও আলোচ্য প্রযোজনায় জমিদারের মুখে উচ্চারিত অতিসরলীকৃত সংলাপগুলি কানে লাগে। ১৮৭৩ সালের বাঙলাদেশে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী শাসক ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধিকারী জমিদারের রাজনৈতিক যোগসাজশ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আহমদ সাহেব যখন জমিদারের মুখ দিয়েই বলান—'আমি জমিদার, ইংরেজ আমার বাপ' অথবা 'সাহেবের পায়ে ধরে ফাদার ফাদার বলব। মীরজাফরের মতন, শুয়োরের বাচ্চার মতন'—তাতে সুস্পষ্ট রাজনীতির আভাস থাকলেও বিষয়টির বাস্তব জটিলতা অনেকখানি নষ্ট হয়। জমিদার সেরাজ আলী আর মেরাজ আলীর চরিত্রে যথাক্রমে তাবিবুল ইসলাম আর আরিফুল হকের উজ্জ্বল অভিনয়ও চরিত্র দুটির সরলীকরণে সাহায্য করেছে। এই দুই চরিত্রের অভিনয়ভঙ্গি আর কস্টিউমিংয়ের মধ্যে নির্দেশক এক ধরনের স্টাইলাইজেশনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রথাগুলি দৃশ্যের একঘেয়ে প্রয়োগ ও বহু ব্যবহৃত সস্তা সূত্রায় ব্যবহারে যে আঙ্গিক গড়ে উঠেছে তা তেমন কোনো বিশেষ মাত্রা তৈরি করতে পারে নি।

এই নাটকের একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো চরিত্র দরিদ্র কৃষককন্যা আমিরন। আহমদ সাহেবের রূপান্তরে চরিত্রটি বোবা এবং শেষ দৃশ্যে প্রতিবাদী। প্রতিবাদী হয়ে ওঠার সুবিধের জন্যই কি বোবা? মূল নাটকের এক সাধারণ চরিত্রকে হঠাৎ বোবায় 'রূপান্তরে'র কারণ হিসেবে সেটা কি খুব যুক্তিযুক্ত?

এই রূপান্তর আর প্রয়োজনার একটি শক্তিশালী দিক গ্রামদেশের শোষণের অমূঘটক হিন্দু-মুসলমান ধর্মনেতাদের আঁতাতের চিত্রটি। বিশেষত যে দৃশ্যে আবুমোল্লার স্ত্রীর উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের নামগান করতে-করতে হাজির হয় জিতু মোল্লা ও হরিদাস বৈরাগী। এই দৃশ্যটির পরিকল্পনা খুবই কল্পনাশীল ও সফল। ইংরেজের পোষা নেটিভ দারোগার চরিত্রটিও একটি সফল হাসির চরিত্র—যা ইদানীংকালে একান্ত দুর্লভ। এ চরিত্রে সুব্রা থোন্দকার অভিনয়ও করেছেন খুবই ভালো। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে মমতাজউদ্দীন প্রথাগুগ ই-বর্ণ আকীর্ণ বাঙলা ছেড়ে পুরনো অনুবাদগন্ধী (বাইবেলের বাঙলা অনুবাদের যে ভাষা) বাঙলা ব্যবহার করেছেন—যা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। মনে রাখার মতন অভিনয় করেছেন জমিদারের প্রাক্তন রক্ষিতা-বৈরাগীর চরিত্রে লাভলী আজিম। তবে প্রাক্তন রক্ষিতার চরিত্রে তাঁকে খুবই অল্পবয়সী মনে হয়েছে। আবু মোল্লা ও তার স্ত্রীর চরিত্রে অভিনেতারা প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন নি।

জ্যামিতিক আকারের প্ল্যাটফর্ম ও ফ্লাট-আকীর্ণ মঞ্চসজ্জা খুবই বাহুল্য মনে হয়েছে। তা ছাড়া কক্ষবিভাজনের রীতিতে অভিনয় (zonal acting) একটি পুরনো ও খুবই অসুবিধেজনক আঙ্গিক। অভিনেতারা এতে কখনোই স্বচ্ছন্দে অভিনয় করার মতন যথেষ্ট জায়গা পান না।

জমীদারদর্পণ নাটকটিকে আধুনিক কালের উপযোগী করে মঞ্চস্থ করার কথা ভেবেছেন 'থিয়েটার' গোষ্ঠী, সেজন্য তাঁদের অনেক ধন্যবাদ। তাঁদের প্রযোজনায় শেষ দৃশ্যে আবু মোল্লা গ্রীক বীরের বেশে সাপ মারার বর্শা তুলে ডাক দেয় যুদ্ধের। (যদিও গ্রীক পোশাকের অসুবঙ্গটা কি বোঝা গেল না) মূলের আবু কিন্তু শেষ দৃশ্যে অসহায়, ভেঙে পড়া মানুষ। এহেন আধুনিকীকরণের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যে প্রথাভাঙার ও পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন ছিল, তার অভাবই এই প্রযোজনাটিকে 'বিশেষ' হয়ে উঠতে দেয় না। রচনা ও প্রযোজনা মিলিয়েই নাটক। রচনার নবরূপায়ণ স্বভাবই দাবি করে প্রযোজনার নতুন আঙ্গিক। দুঃখের বিষয় এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটে নি 'থিয়েটারে'র 'জমীদারদর্পণ' নাটকে।

নাটক—জমীদারদর্পণ
রচনা—মীর মশার্‌রফ হোসেন
নব নাট্যায়ন—মমতাজউদ্‌দীন আহমদ
প্রযোজনা—থিয়েটার, বাংলাদেশ

মধুশ্রী দত্ত

আমাদের কানাইদা

পরিণত বয়সেই কানাইলাল সরকার চলে গেলেন। অভিযোগ জানাবার উপায় নেই। ক্লান্তি এসে ইদানীং তার অমিতপ্রমাণ প্রাণশক্তি এবং স্ফূর্তিকে মাঝে-মাঝেই খণ্ডিত করে দিচ্ছিল। থেকে-থেকেই প্রতিবাদ জানাচ্ছিল দেহের নানা কলকবজা। কমে আসছিল চোখের জ্যোতি। চিরপরিচিত জগৎ, থেকে-থেকে, অকারণে কিছু বেয়াড়া আচরণ ক'রে, তাঁকে দুঃখ দিচ্ছিল। তাঁর ঘরের আরামকেদারায় বসে মাঝে-মাঝে তিনি বলে ফেলছিলেন, "কিছু ভালো লাগছে না।" শুনে মন বিষাদে ভরে যেত। কানাইদা বিরূপ কিছু দেখলে জ্বলে উঠতে জানতেন। এই এতখানি পথ পেরিয়ে এসে হঠাৎ দুঃখের পাঠ নিতে শিখলেন তিনি কার কাছে? তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সংলাপ টেলিফোনে। তিনি সামান্য, অতিসামান্য, একটি কাজ করে দিতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন—"এই তোমাকে শেষবারের মতো বিরক্ত করছি। আর করব না।" যদি তিনি রাগ বা অভিমান করে ওকথা বলতেন আমার খুব কিছু প্রতিক্রিয়া হত না। কিন্তু অদ্ভুত বিষণ্ণ গলায় কথাটা বলেছিলেন তিনি। শীতের বিকেলে রোদ্দুর পড়ে আসার মতো বেদনা ছিল তাতে। বহুক্ষণের জন্য সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে থাকা পাখির মতো আমি নিশ্চল হয়ে ছিলাম।

কেউ সত্যি চিরকালের মতোই একেবারে আড়ালে চলে যাবে, একথা কে ভাবে? বিশেষত কানাইদার মতো এত জাগরূক একজন মানুষ, পূর্ণিমার আকাশ থেকে উছলে-পড়া আলোর মতো যাঁর দিগন্তভাসানো জীবনীশক্তি! তিনি চলে গেলে সব কত ফাঁকা হয়ে যাবে তা তাঁর চিরমুক্তির আগেও বুঝতে পারি নি। নিমতলার ভূমিশয্যায় শুয়ে থাকা তাঁর নিস্পন্দ দেহের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, মৃত্যু হলে মানুষের চোখের পাতা এমন করে বুঁজে আসে কী করে। এলোক থেকে ওলোকে চলে যাবার প্রথম চিহ্ন কি দৃষ্টির দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া? উভয় ভুবনের মাঝে ওটাই কি অকম্পিত যবনিকা?

শান্তিনিকেতনে তখন নবীনতম ছাত্রগোষ্ঠির একজন আমি। দূর থেকে কানাইদাকে দেখিয়ে কে একজন বললে—"উনি? উনি কানাইলাল সরকার। দুর্বাসা মুনি। সর্বক্ষণ রেগে থাকেন।

স্মরণে

এক মাইলের মধ্যে যেও না বাপু। মারা পড়বে।" আমি তাকিয়ে দেখলাম। উত্তেজিতভাবে কিছু বলছিলেন কানাইদা কাউকে, তর্জনী নাচিয়ে-নাচিয়ে। মনে হতে পারত বটে, কেউ ভুল করে কানাইদার এক মাইলের মধ্যে চলে গেছে, এবার লোকটা মরবে। কিন্তু না, হঠাৎ কানাইদা হেসে ফেললেন। অদ্ভুত সেই হাসি, হৃদয়ে সামান্য মলিনতা থাকলে কেউ অমন হাসি হাসতে পারে না। সেই দিনের পর দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ওই হাসি আর ওই রাগের পাশাপাশি থেকেছি। হাসির মাধুর্য দিনে-দিনে বেড়েছে, রাগপ্রকাশ দেখে তেমন ভীত কখনও হই নি। কানাইদার আসল চেহারাটা বহু আগেই দেখে ফেলেছি কিনা।

তবে জীবনে প্রথমবার কানাইদার কাছে বকুনি খেতে খুব খারাপ লেগেছিল। বর্মণ স্ট্রীটে তখন আনন্দবাজার অফিস। রথীদা (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) একখানা চিঠি দিয়েছিলেন কানাইদার হাতে তুলে দেবার জন্য। খামবন্ধ চিঠি, তাতে সাপ ব্যাঙ কী আছে আমি কী করে জানব? চিঠি পড়ে কানাইদা একেবারে অগ্নিশর্মা। আমাকে এবং সঙ্গী লোকনাথদাকে (কবি-সাহিত্যিক লোকনাথ ভট্টাচার্যকে) বিষম ধমকাতে লাগলেন। চারপাশে যাঁরা ছিলেন, কানাইদার তখনকার সহকর্মীরা, সবাই যেন পারলে টেবিলের তলায় ঢুকে যান। কথার মাঝে ঝনঝন টেলিফোন বাজতে রিসিভার তুলে ওধারের মিসিবাবাকে (কলকাতার টেলিফোন তখনও স্বয়ংক্রিয় হয় নি) যা গালমন্দ করলেন তাতে বেচারার চোখ থেকে নায়েগ্রা নামবার কথা। এত জোরে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন, তাতে গোটা যন্ত্রটারই পঞ্চত্ব পাবার কথা। তখনকার টেলিফোন দারুণ দবেজ যন্ত্র ছিল, তাই শতখণ্ড হয় নি। ভিতরে-ভিতরে আমারও রাগ জমছিল। কানাইদা একটু দম ধরতে আমি বললাম, "আমি দূতমাত্র। কোন্ খবর নিয়ে এসেছি সেটাও জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে দূত যে অবধ্য সেটা আপনি মানেন না।" মনে-মনে স্থির করেছিলাম, ফের যদি উনি মেজাজ করেন তবে দুত্তোর বলে বেরিয়ে চলে যাব। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে কানাইদা হঠাৎ হেসে ফেললেন। আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসে

বললেন, "না না, তোমার কী দোষ, তোমার কী দোষ! শুধু ওই, ওই ছাটমানকে (রথীন্দ্রনাথকে) বলে দেবে, কানাই সরকার কারও চাকর নয়।" কোথা থেকে সুস্বাদু ছানার জিলিপি আনিয়ে পরম স্নেহে খাওয়ালেন আমাদের। শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে যথাসাধ্য নির্দোষ একটা রিপোর্ট দিলাম রথীদাকে। রথীদা মৃদু হাসলেন। "ঠিক ওইভাবে কথাবার্তা হয় নি, কী বল! তা হোক, তা হোক। কাজটা ঠিকই করে দেবে।" রথীদার অনুমান ঠিকই ছিল, কানাইদা কাজটা নিখুঁতভাবে করিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা যখন পাকাপাকি আনন্দবাজারের কর্মী, তখন অফিস উঠে এসেছে প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটের প্রাসাদে। একদা দুঃখের ও ত্যাগের এবং সাহসিক সংগ্রামের যে ইতিহাস সংস্থা হিসাবে আনন্দবাজারকে অনন্যতা দিয়েছে, সেই স্মৃতি কানাইলালের চিন্তনে চির-উজ্জ্বল থেকেছে। দুঃখের দিনের সহকর্মীদের কখনও ছোটো করে দেখেন নি তিনি। সংস্থার প্রতি আনুগতাকে তিনি আবশ্যিক চরিত্রধর্ম বলে বরাবর মনে করে এসেছেন। যার ওপর রাগ করে কথা বন্ধ রেখেছেন, মনে-মনে তাকে ক্ষমা আগে থেকেই করে রাখতেন যদি জানতেন যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার আনুগতা আছে। ওটুকু ছিল তাঁর ন্যূনতম দাবি। তবে যাদের অন্তর থেকে ভালোবাসতেন রাগ করতেন তাদের ওপরই বেশি। ঝড়ঝাপটা, অভিমান, কানাইদার ডোন্ট্-টক করে দেও গম্ভীর মুখ—এসব তাদেরই সইতে হত বেশি। বিনিময়ে তারা ভালোবাসা পেত অজস্রধারায়। সেই প্রীতির গণ্ডি অফিস ছাড়িয়ে বহুদূর বৃত্তে-বলয়ে নিবদ্ধ ছিল। অফিসের মানুষ তাঁকে যতটা কাছে পেয়েছে, বাইরের মানুষ তার চেয়ে কম পায় নি। আনন্দবাজারের সার্থকতম প্রতিনিধিদের অন্যতন পুরুষ ছিলেন কানাইলাল। চটিয়ে দিয়ে, চটাচটি করে ক্ষুব্ধ করে তুললেন আজ যাঁকে, দুদিন বাদে তিনিই ঢুকছেন আনন্দবাজার অফিসে, কানাইদার সঙ্গেই দেখা করতে। আনন্দবাজার যে একটা বদ্ধ, সীমাবদ্ধ, ঘোলা জলের ঘূর্ণি হয়ে যায় নি তার জন্য একটা সময়ে তিনটি মানুষের দান ছিল সর্বাধিক—অশোককুমার, সন্তোষ কুমার এবং কানাইলাল। সাহিত্যিক হয়েও শেষপর্বে যদি সন্তোষকুমার ঘোষ চলে গিয়ে থাকেন সংগীতের দিকে, তবে অ-সাহিত্যিক কানাইলাল প্রবেশ করেছিলেন সাহিত্যের এবং শিল্পের গণ্ডিতে। নিজে সৃষ্টি করতে বসেন নি, কিন্তু যাঁরা প্রতিভাবান অকপটে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। বই বা ছবির বিক্রি বা পাবলিসিটি করেছেন উদার দাক্ষিণ্যে। নিজের শক্তিক্ষয় করে, গাড়ির তেল পুড়িয়ে ছুটোছুটি করেছেন সারা কলকাতা। পরিবর্তে কখনও যদি অকৃতজ্ঞতা এবং বিরলক্ষেত্রে কৃতঘ্নতা উপহার পেয়ে থাকেন তাতে মাত্র সাময়িকভাবে দমে গেছেন। পরমুহূর্তে সব ঝেড়ে ফেলে আর কারও উপকার করার ব্রতে নেমে পড়েছেন। এমন সহৃদয় দয়ার্দ্র মানুষ জীবনে কমই দেখেছি।

খামখেয়ালি বিধাতা তাঁকেও গড়েছিলেন নিজের আদলে। অহরহ নিজেকে নিজেই তিনি contradict করতেন। আজ যাকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না, কাল তারই জন্যে কাঠ-কাটা রৌদ্রে অসুস্থ শরীরে বাড়ি খুঁজতে বের হলেন। এ ধরনের সহস্র ঘটনা কাহিনীর আকারে সারা রাজ্যে ছড়ানো। সবাই শুনেছেন তার কিছু কিছু। ওইসব কাহিনী কখনও অতিরঞ্জিত হয়ে জীবৎকালেই কানাইদাকে চলমান উপকথা করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা বা অপ্রীতি কখনও উৎসারিত করে নি। যাঁরা বুদ্ধিমান, যাঁরা দরদি, তাঁরা নির্ভুলভাবে বুঝতে পেরে গেছেন যে কলুষস্পর্শহীন, বিদ্বেষবিহীন, তেজী এবং খাটি এক মানুষের সামনে তাঁরা বসে আছেন। যথার্থ মানুষ এই যুগেও মেলে।

রসায়নের ছাত্র, চিনি-শিল্পের প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করে তিনি কাজ করেছেন এখানে ওখানে। গেছেন সেই দূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। কিন্তু তাঁর জীবন পূর্ণতা পেয়েছে দুটি ক্ষেত্রে। শৈশবে শান্তিনিকেতন আশ্রমে এবং গাঢ় যৌবন ও প্রৌঢ় দশায় আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানে। প্রেসিডেনসি কলেজ থেকে যখন আমি বিশ্বভারতীতে পড়তে যাই, তখন আমার শুভানুধ্যায়ীরা বড়ো দুঃখ পেয়েছিলেন। তাঁদের দোষ দিতে পারি না। শান্তিনিকেতন এবং তার প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য সম্বন্ধে বিশেষত বাঙালির বিরূপতার তো অবধি নেই। আজও ক্ষণে ক্ষণে বিষ-বিস্ফোরণ ঘটে, দেখতেই তো পাই। আসলে বিরূপতা যত, তার চেয়েও বেশি অদ্ভুত কিম্ভূত সব ধারণা। তার একটা হল, শান্তিনিকেতনের ছেলেরা সব ললিতলবঙ্গলতা। কানাইদা জানতেন না, এই ব্যাপারে, অর্থাৎ এই অপ-ধারণা ঠেকাবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন

আমাদের তুরুপের তাস। কেউ প্রসঙ্গটা তুললে তৎক্ষণাৎ আমরা কানাইদার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সমালোচককে স্তব্ধ করে দিতাম।

সমাজবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়েও কানাইদা শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকেন নি। কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্রের মতো এখানেও তিনি অগণিত মিত্র সংগ্রহ করে গেছেন। ডিলান টমাস যে বলেছেন স্টার গ্যাদারার, এক উত্তুঙ্গ পুরুষ আকাশপথে চলেছেন এবং নক্ষত্র সংগ্রহ করছেন, কানাইদা ছিলেন সেই মানুষ। জীবনের যে পরিমণ্ডলে যখন গেছেন, অজস্র উজ্জ্বল বন্ধুত্ব সংগ্রহ করে এসেছেন। কখনও নিজের জন্য, কখনও আনন্দবাজার নামক অনন্য এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য।

কানাইদাকে প্রণাম করতে গিয়ে বার বার প্রণাম করতে হবে আমাদের অমলাদিকে (অমলা মাসীকে)—শিল্পী, সংগীতগুণাদাত্রী, প্রতিভাময়ী ওই মহিলা কানাইদার মতো দুর্বাসাকে যাজ্ঞবল্ক্য করে তুলেছেন আমাদের চোখের সামনে। কানাইদার সরল আত্মভোলা ব্যক্তিত্বকে কৌণিক শুভ্রতা দান করেছেন। কানাইদাকে একলা চলার কথা কখনও ভাবতে হয় নি।

অশোকবাবুর আকস্মিক প্রয়াণ কানাইলালের জীবনরাত্রির বহু নক্ষত্রকে এক দমকে নিভিয়ে দিয়েছিল। আর তিনি পুরানো চিরচেনা কানাইদা হয়ে উঠতে পারেন নি। এমন কি আশৈশব বন্ধু কঙ্করদাও (ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন) আর তাঁকে তত উদ্দীপিত করতে পারতেন না।

বেলভিউ হাসপাতালে তিনি ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, ঠিক ছিলেনও না আর। নিমতলায় শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গেলাম। আগুন যখন সহস্র শিখার বন্ধনে তাঁকে জড়িয়ে নিল, সেই মুহূর্তে মনে পড়ে গিয়েছিল —Spare the heart! This was unique! অমন একটি হৃদয় স্বর্গের তোষাখানার সামগ্রী।

অরুণ বাগচী

IN-LAWS OR OUTLAWS

There is nothing like a dowry to give any marriage a bad name. And a bad start

It takes your son's pride away
It makes your daughter lose her dignity
It strains family relations for generations to come.

Help eradicate dowry.
Educate your children.
Don't subsidise a marriage.

Remember, Dowry is prohibited by law.

Progressive UIB-6/84

UIB—With the people... for the people.

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED
Head Office : 17, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001
Regd. Office : 7, Red Cross Place, Calcutta-700 001